উপন্যাস

সংসারে এক সন্ন্যাসী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com

সূচিপত্র

১-২. ঘুম ভাঙার পর 2
৩-৪. সন্ধের পর 3 2
৫-৬. বিকেলবেলা 6 1
৭-৯. অনেক বেলা........ 1 0 7

১-২. ঘুম ভাঙার পর

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরই মানবেন্দ্রর মনে পড়ল প্রজাপতিটার কথা। তিনি মাথা ঘুরিয়ে ডান পাশে তাকালেন। প্রজাপতিটা এখনও নিথর নিস্পন্দ হয়ে দেয়ালের গায়ে লেপটে আছে। গুণ্ডা টিকটিকিটা ধারেকাছে কোথাও নেই।

প্রজাপতি নয়, মথ। বেশ বড়, দুই ডানার বিস্তৃতি প্রায় তিন ইঞ্চি, গাঢ় বেগুনি ভেলভেটের মতো গা। প্রাণীটি বড়ই শান্ত এবং সুন্দর। প্রজাপতির চাঞ্চল্য মথের থাকে না। মথের কোনও প্রচলিত বাংলা নামও নেই। কাল রাতে মানবেন্দ্র কিছুক্ষণ শুয়ে চিন্তা করেছিলেন মথের বাংলা ডাকনাম কী হতে পারে। পছন্দমতো কিছু খুঁজে না পেয়ে এক সময় বিরক্ত হয়ে ভেবেছিলেন, আমাকে তো কেউ প্রতিশব্দ খোঁজার দায়িত্ব দেয়নি। আমার মাথা ঘামাবার দরকার কী! যদিও প্রজাপতির মতো মথেরও একটা সুন্দর নাম প্রাপ্য ছিল।

মানবেন্দ্র বিছানা থেকে উঠে এসে একটা জানলা খুলে দিলেন। কাল রাতে খুব শীত ছিল, সব জানলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এখন টাটকা হাওয়া ঝলকে ঝলকে ঘরে আসে। এবং শরীরের মধ্যেও ঢুকে, মনে হয় যেন রক্ত, শিরা-উপশিরা ধুয়ে দিচ্ছে, পরিচ্ছন্ন করে তুলছে সকালবেলার মানুষকে। মানবেন্দ্র একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। তার জানলার ঠিক নিচেই একটি চন্দ্রমল্লিকা ফুল গরবিনীর মতো ভুরু তুলে আছে। যেন সে মানবেন্দ্রর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

মানবেন্দ্র চন্দ্রমল্লিকাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী, ভাল আছ?

হাওয়ায় দুলছে ফুলটি।

মানবেন্দ্র আবার বললেন, রাত্রে কেউ অভিসারে এসেছিল? কাল খুব জ্যোৎসা ছিল আমি জানি।

দরজায় টকটক শব্দ হল। মানবেন্দ্র জানলা থেকে সরে গিয়ে দরজা খুললেন। সাদা উর্দি পরা টুরিস্ট লজের বেয়ারা। সে বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, স্যার, বেড টি?

মানবেন্দ্র বললেন, নেহি রামচন্দ্রন, এক পট কফি লে আও।

ব্রেকফার্স্ট কেয়া।

কুছ নেই, নো ব্রেকফার্স্ট।

বেয়ারাটি তবু দু'এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি সাহেবদের এই অনিচ্ছা তার পছন্দ হয় না। মানবেন্দ্র প্রায়ই কিছু খেতে চান না। অনেক সময় সারাটা দিন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন।

নিজে থেকে সে আর কিছু বলতে সাহস পেল না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে সে বেরিয়ে গেল।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মানবেন্দ্র আবার এলেন জানলার কাছে। এই জানালাটি তার খুব প্রিয়। জানলার বাইরে বহু দূর পর্যন্ত শুন্য প্রান্তর, একটা গাছ পর্যন্ত নেই। এদিকে চাষবাস বিশেষ হয় না, রুক্ষ পাথুরেমাটি। কিছুই দেখার নেই, তবু এই বিশাল ব্যাপ্ত শূন্যতা চক্ষুভরায়। দিগন্তের কাছে আবছা পাহাড়ের রেখা। আজ আকাশ মেঘলা। হালকা মেঘের উপচ্ছায়ায় একটি ম্লান দিন সবুজকে ধূসর হতে ডাকে!

তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বেগুনি ভেলভেটের মতো মথটিকে বললেন, তুই কেন চুপচাপ বসে আছিস রে?

মথটি কোনও উত্তর দেয় না।

মানবেন্দ্রর ইচ্ছে হয় মথটির ডানায় একবার আঙুল ছোঁয়াতে। ও এমন ভয়হীন ভাবে বসে আছে যে, মনে হয় উড়ে পালাবেনা। কিন্তু প্রজাপতি বা মথকে মানুষ একবার ছুঁলে তারা নাকি আর বাঁচে না। সুতরাং মানবেন্দ্র নিবৃত্ত হলেন।

মানবেন্দ্র আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, তুই কি সারা দিন এখানে বসে থাকবি নাকি? তোর খিদে পায় না?

জানলার পাশ থেকে চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি বলল, আমার সঙ্গে তোমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি। তুমি চলে গেলে কেন?

মানবেন্দ্র সে-কথা শুনতে পেলেন না। মথটিকে নিয়ে এখন ব্যস্ত।

মানবেন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে গুণ্ডা টিকটিকিটাকে খুঁজলেন। সেটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাল সেই টিকটিকিটা এই মথটিকে খাবার জন্য বহুক্ষণ তাক করে বসে ছিল।

এই ঘরে তিনটি টিকটিকি আছে। এই টুরিস্ট লজটি একটি ছোটখাটো টিলার ওপরে তৈরি। কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। তবু এখানে টিকটিকি কী করে এল সে-সমস্যার সমাধান করা যবে না। মানবেন্দ্র যেহেতু বেশির ভাগ সময়েই ঘরের মধ্যে একা একা থাকেন এবং দেয়ালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা তার পুরনো স্বভাব, তাই টিকটিকিদের জীবন সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ, একথা বলা যায়। তিনি জানেন, টিকটিকিদের মতো এমন যৌনকাতর প্রাণী আর আছে কি না। সন্দেহ। ওদের সমাজে স্নেহ-প্রেম-দয়া- মমতার কোনও অস্তিত্ব নেই, ওরা কেউ কারুর ভাই-বোন পিতা-মাতা, বন্ধু হয় না। দু'টি টিকটিকি কাছাকাছি এলেই পরস্পরকে আক্রমণ করে এবং পালায়। কখনও যে জয়ী হয় সে পরাজিতের টুঁটি কামড়ে ধরে দ্রুত যৌনমিলন সেরে নেয়।

এ ঘরের তিনটি টিকটিকির মধ্যে তিনি একটার নাম রেখেছেন তিনি মাফিয়া। সেটার চেহারা দুর্দান্ত গুণ্ডার মতো। পুরনো ঘিয়ের মতো রঙ, চওড়া বুক টেরাডাকটিলের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে হিংস্র ভাবে তাকায়। সেই টিকটিকিটাকে মানবেন্দ্র বেশ ভয় পান। যারা

আরশোলা, টিকটিকি বা মাকড়শা দেখলে আঁতকে লাফিয়ে ওঠে, মানবেন্দ্র সেই জাতের মানুষ নন, তিনি জানেন, টিকটিকির কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। তবুওই মাফিয়া শুধু তার চেহারাতেই ভয় দেখায়।

অপর একটি টিকটিকির ছিমছাপ পরিচ্ছন্ন চেহারা, একটু দুঃখী দুঃখী ভাব, মানবেন্দ্র একে বেহুলা বলে ডাকেন। কোনও যুক্তি নেই, এমনি মনে পড়েছে নামটা।

তৃতীয় টিকটিকিটা বেরোয় খুব কম, ঘুলঘুলির আশ্রয় ছেড়ে সে কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে, রোগা লম্বা মতো, এর নাম শাইলক। সর্দার মাফিয়া, বেহুলা এবং শাইলক, এই তিনটি চরিত্র নিয়ে নতুন কোনও কাব্য সৃষ্টি করা যায় কি না, সে-সম্পর্কে মানবেন্দ্র চিন্তা করেন এদের দেখে।

কাল রাত্রে মথটি বড় অদ্ভুত ভাবে এসেছিল। মানবেন্দ্র এক মুহূর্ত আগেও দেখেছিলেন সাদা দেওয়াল, পরের মুহূর্তেই দেখলেন দেয়ালে ডানা মেলে মথটি স্থির হয়ে বসে আছে। ও কখন ঘরে ঢুকল কে জানে। ঠিক যেন ম্যাজিক। মাফিয়াটি ওকে খাওয়ার জন্য তাক করে বসল। মাফিয়ার হাত থেকে ওর নিস্তার পাবার কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। মথটি কিন্তু একবারও আর নড়েনি, জায়গা পালটায়নি, মহারানির মতো অভিজাত ভঙ্গিতে আর সব কিছু অগ্রাহ্য করে বসেছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি ওর নাম দিলেন মহারানি। নাটকের চতুর্থ চরিত্র।

মানবেন্দ্র একবার ভেবেছিলেন মাফিয়ার সামনে একটা লাঠি নিয়ে নাড়াচাড়া করে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবেন কিংবা একটু খোঁচা দিয়ে উড়িয়ে দেবেন মথটাকে। এমন একটা সুন্দর জিনিসকে ওই গুণ্ডাটা শেষ করবে, এটা তার পছন্দ হয়নি। পরে আবার ভেবেছিলেন, প্রকৃতির মধ্যে তো প্রতিনিয়ত এই খেলাই চলছে। তিনি সে-খেলা বদলাবার কে? তার চেয়ে দূর থেকে এই খেলার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা অনেক ভাল। হয়তো টিকটিকির খাদ্য হবার জন্যই মথটা উড়ে এসেছে এখানে।

মথটা যে সকালবেলাতেও বেঁচে আছে, সেটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। কাল রাতে অনেকক্ষণ ধরে খেলাটা দেখতে দেখতে মানবেন্দ্র কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মহারানির থেকে মাফিয়া ছিল প্রায় তিন হাত দূরে। অন্য দেয়ালে বেহুলা তখন চুপচাপ উদাসীন। মাফিয়া চুল চুল করে এগোচ্ছে, এই সময় ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে এল শাইলক, সোজা ছুটে গেল বেহুলার দিকে। ঘাড় না ফিরিয়েও মাফিয়া তা দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যকে ছেড়ে সে-ও তাড়া করে গেল ওই দু'জনের দিকে। ওদের লড়াই মানে তো শুধু ছুটোছুটি, অঙ্গ স্পর্শ খুব কম হয়। অন্য দু'জনকে ঘরের দুই প্রান্তে তাড়িয়ে মাফিয়া আবার মনঃসংযোগ করেছিল মহারানির প্রতি।

বেয়ারা কফি এনেছে। বাইরে কয়েকটি শিশুর কলকণ্ঠ ও ছোটাছুটির আওয়াজ। মানবেন্দ্রর মনে পড়ল, কাল মাঝরাত্রে একটি গাড়ি এসেছে, বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল, বেশ বড় একটি পরিবার। ব্যাপারটা মানবেন্দ্রর পছন্দ হয়নি। এই টুরিস্ট লজটি নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখনও জনপ্রিয় নয়, মানবেন্দ্র নির্জনতা আশা করেছিলেন।

বিল সই করতে করতে মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, রামচন্দ্রন, কাল কারা এসেছে?

রামচন্দ্রন উৎসাহ দেখিয়ে বলল, বাঙালি ফ্যামিলি, দো ঠো কামরা লিয়া।

বাঙালি শুনে মানবেন্দ্র আর একটু নিরাশ হলেন। জল যেমন জলকে টানে, তেমনি বাঙালি যায় বাঙালির কাছে। ওরা নিশ্চয় তার সঙ্গে আলাপ করতে আসবে।

ভুরু ও মুখ কুঁচকে একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মানবেন্দ্র। তারপর ফস করে একটা চুরুট ধরালেন। আজ সকালে এইটি তাঁর প্রথম ভুল। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার আগেই চুরুট ধরালে সারা দিন মুখটা বিশ্বাদ হয়ে থাকে।

আড়াই কাপ কফি শেষ করার পর মানবেন্দ্র একটা বই (সোয়ানস ওয়ে, ২য় খণ্ড) নিয়ে আবার বিছানায় ফিরে গেলেন। তিনি নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন, আজ শুয়ে শুয়েই কাটাবেন সারাটা দিন। চুরুটের ছাই ফেলার অ্যাশট্রের জন্য একবার তাকালেন এ-দিক

ও-দিক। অ্যাশট্রেটা রয়েছে একটু দূরে টেবিলের ওপর। আবার উঠে গিয়ে ওটা আনার কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে মেঝেতে ছাই ফেলা ভাল। জমাদার আসবে এগারোটার সময়ে।

প্রুস্তের উপন্যাসটির বারো ভল্যুম তিনি কিনেছিলেন অনেক দিন আগে, যে-সময় তার যথেষ্ট টাকার টানাটানি ছিল, যে-সময় ট্রামে বাসে এক দিন টিকিট ফাঁকি দিলে আনন্দ হত। যে-সময় কোনও বন্ধুকে দু'টাকা ধার দিলেও সব সময় মনে থাকত সেই টাকাটার কথা। যাই হোক, অনেক কষ্টে টাকা সংগ্রহ করে বইগুলি কিনলেও পড়া হয়ে ওঠেনি। নিজের কেনা বই সম্পর্কে পড়ার আগ্রহ কম থাকে। অপরের কাছ থেকে চেয়ে আনা বই দ্রুত শেষ হয়ে যায়। প্রথম খণ্ডের বেশি এগোতে পারেননি। এবার ঠিক করেছেন শেষ করবেনই–বিক্রি করে দেবার আগে। আর দু'মাসের মধ্যে মানবেন্দ্র তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সব বিক্রি করে দেবেন ঠিক করা আছে।

আর মাত্র দু'মাস সময় আছে তার জীবনটা নিয়ে পরীক্ষা করার। তারপর একটা কিছু হেস্তনেস্ত তো করতেই হবে।

পড়ায় মন বসছে না। বাইরে শিশু, নারী ও পুরুষের নানা রকম কণ্ঠস্বর। বাংলা। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে। এক জন কেউ গুন গুন করে দু-এক লাইন গান গেয়ে উঠছে। কোনও নারী। মানবেন্দ্র গানের কথাগুলি শোনার জন্য উৎকর্ণ হলেন।

...আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু মুহুর মুহু
আজ কাননে ওই বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে।
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরানবঁধু
চাঁদের আলোয় ওই বিরাজে....

বইটা মুড়ে সরিয়ে রাখলেন মানবেন্দ্র। তার ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। অকস্মাৎ আনন্দ পেলে এরকম হয়। কোকিলে গেয়েছে কুহুর পরই মুহু মুহু শব্দটা তো

খুব ভালই লাগিয়েছে বুড়ো। এর মধ্যে একটা স্নিগ্ধ বুদ্ধির পরিচয় আছে। অবশ্য এর পরেই 'আজ কাননে ওই বাঁশি বাজে' অতি বাজে লাইন। এবং পর পর চার লানে 'আজ'! কত কবিতায় আর কত গানে যে উনি বাঁশি বাজিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। আসলে প্রণয় কাব্য লিখতে গিয়ে উনি রাধাকৃষ্ণর ইমেজটা মন থেকে সরাতে পারেননি কখনও। যত মিলন, যত অভিসার, যত বিরহ, সবই রাধাকৃষ্ণ টাইপের।

মেয়েটির গানের গলা ভাল। কীরকম দেখতে? বিছানা থেকে উঠে দরজা খুললেই দেখা যায়। কিন্তু সেটুকু আলস্য কাটাতেও রাজি নন মানবেন্দ্র।

কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়, ওরা লনে চেয়ার পেতে বসেছে। একটি গভীর পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, আর এক কাপ চা হবে নাকি?

আর একটি তরল পুরুষকণ্ঠ :নিশ্চয়ই। চমৎকার ওয়েদার! চলল, এবার বেরোই।

মেয়েটির গান হঠাৎ থেমে গেল। মেয়েটি কারুকে শোনাবার জন্য নয়, আপন মনেই গাইছিল, কিন্তু দু'টি শিশু ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। তার পরই কান্না।

মানবেন্দ্র আবার বিরক্তিতে ভুরু কোচকালেন। এই বাচ্চাগুলো খুব জ্বালাবে। যে-নির্জন বিশ্রামের সন্ধানে মানবেন্দ্র এখানে এসেছিলেন, আজ থেকে তা গেল। মানবেন্দ্র বাচ্চাদের পছন্দ করেন না। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা শহরতলিতে। খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলা–- পরম সত্য এই অমর দুটি লাইন যে রচনা করেছে, সে মহাকবি।

বাইরে গোলমাল বেশি বাড়ছে। নারীকণ্ঠ একজনের নয়, দুজনের, এদের মধ্যে কে গান গাইছিল। ফরাসি সাহিত্যের বিখ্যাত রচনার চেয়েও এই সব কলকণ্ঠ মানবেন্দ্রর মনোযোগ কেড়ে রাখে।

মানবেন্দ্র একটুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আবার যখন জেগে উঠলেন, তখন সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। ওরা নিশ্চয়ই বেড়াতে গেছে। তার স্নান করার ইচ্ছে হল। শীতের আয়াসে গত

দু'দিন স্নান করেননি। আজ শরীরে একটা আঠা-আঠা ভাব। স্নান টান করতে তার প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল। বাথরুম থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন উলঙ্গ হয়ে। একা বন্ধ ঘরে তিনি অনেক সময়ই উলঙ্গ হয়ে থাকেন। কিন্তু এখন বেশ শীত করছে। তিনি এক জোড়া নতুন কাচা পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে তার ওপর শালটা জড়িয়ে নিলেন। আঃ, এর মতন আরাম আর নেই। টেবিলের কাছে চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে বসে তিনি একটুক্ষণ এই আরামটুকু উপভোগ করলেন। সামান্য খিদেখিদে পাচ্ছে। এই খিদেটাও উপভোগ্য।

দেয়ালে মথটা সেই একভাবেই বসে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী মহারানি, আজ কি প্রায়োপবেশন নাকি?

মহারানি একটুও বিচলিত হয় না।

না, এর একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। মানবেন্দ্র চেয়ার থেকে উঠে এসে মহারানির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এর কোনও ভয় পাবার লক্ষণ নেই। এ-রকম ভয়হীন সুন্দর সহজে দেখা যায় না। টিকটিকি তিনটিই আজ সকাল থেকে অদৃশ্য হয়ে আছে কেন কে জানে।

তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চন্দ্রমল্লিকাকে বললেন, ভাই, তোমার গাছ থেকে একটা পাতা নিচ্ছি, কিছু মনে করো না।

পাতাটা ছিঁড়ে এনে তিনি মথটার মুখের সামনে দাঁড়ালেন। এই প্রথম সে একটা ডানার কম্পন দেখাল। তারপর বিরক্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে উড়ে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। মানবেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাকি দুটি জানলা ও দরজাও খুলে দিলেন, যাতে ও যে-কোনও জায়গা দিয়ে বেরুতে পারে। কিন্তু ওর মতিগতিই অদ্ভুত। এবার ও গিয়ে বসল বেশ উঁচুতে, ঘুলঘুলির পাশে। ওই ঘুলঘুলিতেই টিকটিকিগুলোর বাস। যে-কোনও সময় বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মথটা কি বাইরে কোথাও যেতে পারত না! যাক, কী আর করা যাবে, ওর নিয়তি! দিনেরবেলা মথেরা কোথায় যায়, মানবেন্দ্র জানেন না।

ঘরে তালা দিয়ে মানবেন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন। একতলা, অর্ধ-বৃত্তাকার বাড়ি। ভারি সুদৃশ্য। আটখানি ঘর। সামনে দিয়ে চওড়া বারান্দা। মাঝখানের বাগানটি এমন ভাবে তৈরি করা, যাতে প্রত্যেকটি ঘর থেকেই তার শোভা উপভোগ করা যায়। মানবেন্দ্র এখানে এসেছেন ছ'দিন আগে, এর মধ্যে আরও কিছু যাত্রী এসেছে, চলে গেছে। একটি ঘরে এক জোড়া ছেলে মেয়ে আছে তিন দিন ধরে, স্বামী-স্ত্রী যে নয় তা এক পলক দেখলেই বোঝা যায়, তারা অন্য কারুর সঙ্গে মেশে না। এ দু'দিনে মানবেন্দ্র সব মিলিয়ে দশ-বারোটার বেশি কথা বলেননি কোনও মানুষের সঙ্গে।

মানবেন্দ্রর এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি পর্যটন দপ্তরের প্রায় এক জন কর্তাব্যক্তি। তিনিই মানবেন্দ্রকে এই জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে মানবেন্দ্রর লিভারে বেশ গণ্ডগোল দেখা যায়। ডাক্তার ও বন্ধুরা বলেছিলেন, তার একটু বিশ্রাম দরকার। ছন্নছাড়া জীবনে লিভার আহত হয়।

পর্যটন দপ্তরের বন্ধুটি এখানে কী চিঠি পাঠিয়েছিলেন কে জানে, তার ফলে এখানকার ম্যানেজার বড্ড বেশি খাতির করে। যেটা অস্বস্তিকর। আবার ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, যেমন, মানবেন্দ্র প্রথম দিন এসে এক বোতল মদ কিনতে চেয়েছিলেন, বেয়ারারা রাজি হয়নি, তাদের সাহেবের নাকি নিষেধ আছে! কোনও ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি তার পছন্দ হয় না। তিনি চান, তাকে নিয়ে কেউ যেন কোনও ব্যাপারে ব্যস্ত না হয়, তাকে নিজের মনে থাকতে দেয়। তিনি এই পৃথিবীতে, নিজের ছাড়া আর কারুর কখনও কোনও ক্ষতি করবেন না।

টুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে মানবেন্দ্র বাঁ-দিকের সরু রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগলেন। ডান দিকের রাস্তাটা গেছে শহরের দিকে। মাইল খানেক দূরে ছোট অকিঞ্চিৎকর শহর। বাঁ-দিকের সরু রাস্তাটা আধ মাইলের পরই নেমে গেছে ঢালু হয়ে মাঠের মধ্যে। সেখানে একটি বস্তি। তার ওপর দিকটায় পাহাড়ের মতো খাড়া পাথর। মানবেন্দ্র এসে সেই পাথরে বসলেন। এখানে বসলে যত ইচ্ছে আকাশ কিংবা দিগন্ত দেখা যায়। আবার নীচের দিকে তাকালেই দেখা যায় বস্তির মানুষদের বিভিন্ন সংসার। এদের ঘরে কোনও আব্রু নেই।

ধর্মকাহিনি পড়লে যেমন মনে হয় ঈশ্বর ওপর থেকে পৃথিবীর সব মানুষের সংসারে দৃষ্টি রাখছেন, সেই রকম মানবেন্দ্রও এখানে একটি ছোটখাটো ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে পারেন। যদিও এঁদের ভাল বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা তার নেই।

এখানকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক মন্দির এবং তার দেয়ালের কারুকার্য ও আদিরসাত্মক মূর্তি দেখার জন্যই ভ্রমণকারীরা আসে। এই কদিনের মধ্যে মানবেন্দ্র একবারও সেই মন্দিরের কাছে যাননি। তিনি তো মন্দির দেখতে আসেননি, এসেছেন বিশ্রামের জন্য। মন্দিরটা কোনও এক সময় দেখে নিলেই চলবে, ব্যস্ততার কিছু নেই। তার বদলে এই উঁচু পাথরটা মানবেন্দ্রর প্রিয় জায়গা।

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, মানবেন্দ্র আবার ধরালেন। হঠাৎ তার অনুভূতি হল, কেউ যেন তাকে লক্ষ্য করছে। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে এ-দিক ওদিক তাকালেন। কাছাকাছি মানুষজন কেউ নেই। কিন্তু একটা কুকুর চুপচাপ এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানবেন্দ্র একটু সতর্ক হলেন। অচেনা কুকুরকে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। ল্যাজটা একটু বেশিঝুলে আছে মনে হচ্ছে না? ল্যাজটা ঠিক কী অবস্থায় থাকলে যেন পাগলা কুকুর চেনা যায়? দুর ছাই, দরকারের সময় এই সব তথ্য একেবারেই মনে পড়ে না।

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

কুকুরটা ছিপ ছিপ ছিপ ছিপ শব্দ করে আরও খানিকটা এগিয়ে এল। হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়াল।

মানবেন্দ্র গলায় নকল গাম্ভীর্য ফুটিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই? এখানে কী চাই তোমার?

কুকুরটার চেহারা ভদ্রগোছের, গৃহপালিত ধরনের। তখন মানবেন্দ্রর মনে পড়ল, অনেক কুকুরই ইংরেজি ছাড়া আর কোনও ভাষা বোঝে না। তিনি বললেন, গো অ্যাওয়ে! গো!

কুকুরটা চঞ্চল ভাবে মাটিতে গন্ধ শুকল, তারপর ধপ করে বসে পড়ল সেখানে। এক একটা কুকুর হঠাৎ দৌড়োয়, কেন দাঁড়ায়, কেন যেখানে সেখানে বসে, তার কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনও দেখা গেছে, একটা কুকুর মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছ, হঠাৎ আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ ঘেউ ডাকতে শুরু করে। আশেপাশে আর কোনও মানুষ বা প্রাণী কিছুই নেই। ওরা কি স্বপ্ন দেখে, না অশরীরীদের দেখতে পায়?

কুকুরটার থেকে তার মনোযোগ সরে গেল একটি কান্নার আওয়াজে। তিনি দেখলেন একজন স্ত্রীলোক হন হন করে ঢালু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বস্তির দিকে, তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটি আট বছরের মেয়ে। কাঁদছে ওই মেয়েটাই।

মানবেন্দ্র ওদের চিনতে পরলেন। স্ত্রীলোকটির নাম মুনিয়ার মা। সেই হিসেবে মেয়েটির নাম মুনিয়া। ওরা ডাকবাংলোয় আসে মাঝে মাঝে। মুনিয়ার কী অসুখ আছে। মানবেন্দ্র ক'দিনই দেখেছেন, মুনিয়ার মা তার মেয়েকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। ওপর থেকে ওদের ঘরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি দেখেছেন মুনিয়ার মা পক্ষীমাতার মতো স্নেহপ্রবণা এবং ব্যাকুল, মেয়েকে নিয়ে তার আদরযত্ন এবং আদিখ্যেতার শেষ নেই। মেয়েকে ওষুধ খাওয়াবার সময় তার মাথায় হাত বোলায় আর কল কল করে কত কথা যে বলে! এত দূর থেকে অবশ্য কথাগুলো বোঝা যায় না।

এক দিন মানবেন্দ্র একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন। একটি শিলে মুনিয়ার মা কয়েকটা শুকনো শিকড় বাটছিল। মেয়ের জন্য ওষুধ। এদিকে অ্যালোপ্যাথির তেমন চল হয়নি বোধহয়। অনেকক্ষণ ধরে বাটছিল শিকড়গুলো, তারপর বুকেরআঁচল সরিয়ে নিজের বাঁ-স্তনটা চেপে ধরল। টপটপ করে দুধ পড়তে লাগল শিলের ওপর।

মানবেন্দ্র তা দেখেই প্রথমে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। একটু পরেই তাকিয়েছিলেন আবার। মুনিয়ার মা তখন অন্য স্তনটা টিপে দুধ বার করছে। মানবেন্দ্রর প্রথম বিস্ময় ছিল এই যে, যার মেয়ের বয়েস ন' বছর, তার বুকে দুধ থাকে কী করে? ওর ঘরে আর তো ছোট বাচ্চা নেই। কিছুদিন আগেই একটা জন্মে মরেছে?

কবিরাজি বা হেকিমি ওষুধ সম্পর্কে মানবেন্দ্রর কোন ধারণা নেই। শিকড়বাটার সঙ্গে অনুপান হিসেবে দুধ মেশাবার ব্যবস্থা থাকে কিনা তিনি জানেন না। নিজের বুকের দুধ! কিংবা হয়তো এমনি দুধ মেশাতে বলেছিল, মুনিয়ার মা তা জোগাড় করতে পারেনি। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা অনৈসর্গিক কিছু আছে বলে মনে হয়। একাগ্র ভাবে দৃশ্যটি দেখতে দেখতে মানবেন্দ্র এক সময় লজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন।

মুনিয়ার মায়ের স্বাস্থ্য ভাল। কারণ তাকে খেটে খেতে হয়। কোনও নারীকে নিজের হাতে তার স্তন ধরে থাকতে মানবেন্দ্র অনেক দিন দেখেননি। কিংবা কখনও দেখেছেন কি? হয়তো মেয়েরা আয়নার সামনে কিংবা বাথরুমে এ-রকম করে থাকে। মানবেন্দ্র ভাবছিলেন শহুরে মেয়েদের কথা, কিন্তু মুনিয়ার মার স্তনে কোনও নগর-সভ্যতা নেই। তার শরীরে একটা শিহরন জেগেছিল। দৃশ্যটা বাৎসল্যের, একটি জননী তার সন্তানের জন্য ওষুধ তৈরি করছে, তবু অন্য পুরুষের চোখ নিজস্ব আনন্দ খুঁজে নেয়।

পরদিনও সেই পাথরটার ওপরে এসে বসবার একটু পর মানবেন্দ্র নিজের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলে। তিনি আবার এসেছেন কি ওই দৃশ্যটা আবার দেখার লোভে? লোভ? অল্প বয়েসে, কৈশোরে কোনও নারীর অনাবৃত বুকের একটু আভাস পেলেই শরীর ঝন ঝন করে উঠত। এই দৃশ্য পুরনো হয় না ঠিকই, কিন্তু এখন মানবেন্দ্র প্রায় চল্লিশে পা দিয়েছেন, এখনও শুধু ওইটুকু দৃশ্য দেখার জন্য তিনি এতটা রাস্তা হেঁটে আসবেন, তা হতে পারে না! কী, ঠিক বলছি তো? মানবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন তার মনকে। মন বেশ দৃঢ়ভাবেই উত্তর দিল, ঠিক। তুমি ওই জন্যই আসোনি। লোভ নয়, তুমি এসেছ কৌতূহলে।

তবু একটু সংশয় থেকে গিয়েছিল। মানুষ কি সব সময় নিজের কাছেও সত্যি কথা বলে?

আজ তিনি দেখছেন আবার অন্য একটা দৃশ্য। মুনিয়ার মা হেঁটে যাচ্ছে হন হন করে, দুলছে তার ভারি শরীরটা, অর্থাৎ রাগ। পেছন ফিরে তাকাচ্ছেনা একবারও। আর মেয়েটা কাঁদছে অশ্রান্ত ভাবে, সে দৌড়ে এসে মাকে ধরছে না, সে আসছে আস্তে আস্তে।

বাচ্চাদের কান্না বিরক্তির। অনেক সময় রাগ ধরে যায়। কিন্তু মুনিয়ার কান্না মানবেন্দ্রর বুকে এসে লাগছিল। এই কান্নাটা তীব্র অভিমানের।

বাচ্চা ছেলে মেয়েরা অন্য সময় কাঁদে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কিন্তু মায়ের ওপরেই যখন রাগ কিংবা অভিমান, তখন আর কার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবে? শিশুর কাছে তার মায়ের চেয়ে ঈশ্বরও অনেক ছোট। এই জন্যই শিশুর অন্য সময়ের কান্না আর নিজের মায়ের ওপর অভিমান করে কান্না –এই দুটো আওয়াজ সম্পূর্ণ আলাদা।

মুনিয়ার মায়েরই-বা এ কী ব্যবহার? যে অসুস্থ মেয়ের জন্য তার এত ব্যাকুলতা, এত মমতা, এখন তাকে এমন অবহেলা করে কেন সে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে? মুনিয়ার মা ডাকবাংলোতে তরকারি বেচতে আসে, সেই জন্যই মানবেন্দ্র দূর থেকে তার নামটা শুনেছেন। তিনি দেখেছেন, স্ত্রীলোকটির মধ্যে মাতৃত্বের ভাব বেশি। খুব সম্ভবওর স্বামী নেই, ওই মেয়েই ওর একমাত্র অবলম্বন। অথচ ওর বুকে দুধ থাকে কী করে? সে যাই হোক, কী দোষ করেছে ওর মেয়ে? কিংবা অসম্ভব কোনও আবদার? হয়তো চেয়েছে কোনও খেলনা কিংবা রঙিন ছিটের ফ্রক, তা-ই ওর মায়ের পক্ষে অসম্ভব। কত লোকের কাছে এটা নিতান্ত হেলাফেলার ব্যাপার।

মুনিয়ার মা একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছেনা, এইবার সে ঢালু জায়গাটা দিয়ে নামবে। মেয়েটা থমকে দাঁড়িয়েছে, ডুকরে ডুকরে কান্নায় সে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করতে চাইছে।

এই হারামি! এই খানকির বাচ্চা! তোর বাপের মুখে লাথি মারি! আমি তোর মাকে–

মানবেন্দ্রর বুকে যেন কেউ একটা বর্শা বিঁধিয়ে দিল। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মুনিয়া মাটিতে বসে পা ছটফটিয়ে ওই সব গালাগালি দিচ্ছে। তার মায়ের উদ্দেশে। কী অসম্ভব সব খারাপ কথা। যদিও ওইটুকু মেয়ে নিশ্চয়ই এসবকথার মানে জানে না। বস্তিতে শুনে শুনে শিখেছে। হয়তো ওরই মায়ের মুখে– ।

মানবেন্দ্রর চোখটা কড় কড় করে উঠল। গভীর দুঃখে বুকটা ভারি হয়ে গেছে। কেন এই দৃশ্যটা দেখতে হল, কেন এই কথাগুলো শুনতে হল! তিনি ওপরের দিকে তাকালেন। কী বিশাল এই আকাশ। চতুর্দিকে মহিমার মতো রোদ্দুর। একঝাঁক তার মধ্য দিয়ে সুন্দরকে আরও সুন্দর করে চলে যায়। যত দূর দেখা যায় ছড়ানো প্রান্তর। এই সবকিছুর মধ্যেই অসীমতার সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে যেন। অথচ এরই মধ্যে এক শিশুর গলায় বীভৎস গালিগালাজ, এক জন মা এত নিষ্ঠুর, এমনকী ওই কুকুরটা হঠাৎ দৌড়ে এসে কেন বসে পড়ল -এ সবই যেন বিপুল রহস্যময়। এই বিশ্বসৃষ্টিতে কোনও কিছুর মধ্যেই আসলে হয়তো সঙ্গতি নেই।

মানবেন্দ্র বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি তাকাতে লাগলেন মা, কুকুর ও বাচ্চা মেয়েটির দিকে। তার মনে হল, এ পৃথিবীকে তিনি কিছুই চেনেন না।

মুনিয়ার মা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, মর, মর, তুই মরিস না কেন? যমেও তোকে নেয় না?

মানবেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। তিনি একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন কুকুটার দিকে। কুকুরটা ভিতুর মতো ছুটে পালাল। তিনি ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসতে লাগলেন মুনিয়াকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু তিনি এসে পৌঁছবার আগেই মুনিয়া কাঁদতে কাঁদতে এবং সমানতালে গালাগাল করতে করতে ছুটে গেল তার মায়ের দিকে। অবিলম্বেই দু'জনে মিলিয়ে গেল ঢালু জমিতে।

মানবেন্দ্র আবার একটা পাথর তুলে নিয়ে একটা পাথরের গায়ে ঘষে ঘষে লিখতে লাগলেন কিছু। একটুক্ষণের মধ্যেই লেখাটা ফুটে উঠল :

না, এসব কিছুই সত্যি না–

.

০২.

আমার নাম অসীম রায়চৌধুরী। আমি বার্ড কোম্পানিতে আছি।

আমার নাম মানবেন্দ্র মজুমদার।

নিজের নাম বলে মানবেন্দ্র কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। আর দেখলেন অসীম রায়চৌধুরীর মুখ। না, সেখানে কোনও পরিবর্তন নেই। অসীম রায়চৌধুরী তার নাম শুনে চিনতে পারেনি।

খাবার ঘরে মানবেন্দ্র একেবারে কোণের দিকে একটা টেবিল নিয়ে বসেছিলেন। ইচ্ছে হলে তিনি নিজের ঘরেও খাবার আনিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তখন এখানে কেউ ছিল না। একটু বাদেই বাঙালি পরিবারটি সদলবলে এসে ঢোকে। ওরা অনেক ঘোরাঘুরি করে এসেছে, খুবই ক্ষুধার্ত। রীতিমতো সোরগোল তুলে দু'টি টেবিল জোড়া দিয়ে ওরা বসল।

মানবেন্দ্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাওয়া সেরে নিয়ে উঠে পড়বেন ভেবেছিলেন। কিন্তু সুপটা সাজ্ঘাতিক গরম, জিভে ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। তিনি সঙ্কুচিত ভাবে বসেছিলেন, যাতে তার উপস্থিতি কেউ গ্রাহ্য না করে।

কিন্তু তিনি একটি ভুল করেছিলেন। ওদের মধ্যে এক জনের হাতে ছিল একটা খবরের কাগজ। মানবেন্দ্র গত ছ'দিনের মধ্যে একবারও খবরের কাগজ পড়েননি, আগ্রহও হয়নি। কিন্তু দূরের খবরের কাগজের হেড লাইনের দিকে চোখ চলে যায়ই। কার যেন মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছে, কোনও বিরাট নেতার, নামটা দেখা যাচ্ছে না।

অসীম রায়চৌধুরী উঠে এসে বলেছিল, আপনি কাগজটা পড়বেন? এখানে বারোটার সময় কাগজ আসে। স্টেশনে গিয়েছিলাম তো।

এটা আলাপের ছুতো। যারা সামাজিক লোক তারা সমশ্রেণীর মানুষ দেখলে আলাপ না করে পারে না। সেটাই ভদ্রতার অঙ্গ। মানবেন্দ্রও অভদ্র হতে চাননা, তিনি মুখটা হাসিহাসি

করে রাখলেন। কথা আর বিশেষ বললেন না। আপনি কবে এসেছেন, মন্দির দেখেছেন কিনা ইত্যাদি দু'একটা প্রশ্ন সেরে অসীম রায়চৌধুরী ফিরে গেল আপন টেবিলে। কাগজটা মানবেন্দ্রর হাতেই রইল। কিন্তু কাগজ পড়ার আগ্রহ তার একেবারেই চলে গেছে। কেন্দ্রের যে মন্ত্রী মারা গেছেন, তাঁর জীবিতকাল সম্পর্কেও মানবেন্দ্রর কোনও কৌতূহল ছিল না।

কাগজের আড়ালে তিনি তাকিয়ে রইলেন ওই দিকের জোড়া টেবিলে। তিন জন পুরুষ, দুজন মহিলা, তিনটি বাচ্চা। দুটি পরিবার না একই পরিবার, তা ঠিক বোঝা যায় না। নারী ও পুরুষেরা সকলেই প্রায় সমবয়সি, কেউই যৌবন পেরোয়নি। তিন জন পুরুষ কেন?

একটি নারীর মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। ধারালো নাক, টানা টানা চোখ, এই সব মেয়ের সাধারণত একটু অহঙ্কারী অথচ কোমল স্বভাবের হয়। মেয়েটি বহু লোকের কাছ থেকে এতবার শুনেছে সে সুন্দরী যে, এ বিষয়ে তার আর কোনও দ্বিধা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এই মেয়েটিকে দেখলে এর সৌন্দর্য বর্ণনায় নিশ্চয়ই পুরো এক পৃষ্ঠা ব্যয় করতেন। মানবেন্দ্র কিন্তু মেয়েটিকে তেমন পছন্দ করলেন না। তিনি আপন মনেই মাথা নাড়লে। যেন তিনি এক সম্রাট, তার এক পারিষদ ওই মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে তাকে উপহার দেবার জন্য, তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন।

অন্য নারীটি তার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। একবারও তাকায়নি। বহু দিনের অভিজ্ঞতায় মানবেন্দ্র জানেন যে, বসে-থাকা অবস্থায় কোনও নারীকে পেছন দিক থেকে দেখে তার রূপ বিচার করা যায় না। শুধু রূপ কেন? নারী মানেই কি রূপ? না, তা নয়। তবে, একথাও তো সত্যি প্রথমেই মনে হয়, ওকে দেখতে কেমন। দেখতে ভাল হলেও অনেককে ভাল লাগে না। এবং দেখতে খারাপ হলে তাকে ভাল লাগতে অনেকটা সময় দরকার। পুরুষ তিন জনের মধ্যে এক জনের চেহারা রীতিমতো চোখে পড়ার মতন। অসীম রায়চৌধুরী নয়। অন্য এক জন, পুরুষোচিত চেহারা যাকে বলে। এই পুরুষটি কোন মেয়েটির স্বামী? মানবেন্দ্র একটু হাসলেন, এটা জানা তার পক্ষে কি খুব দরকারি? তবু, এটা যেন একটা সরল অঙ্ক, না মিললে স্বস্তি নেই। দুটি নারী, তিনটি পুরুষ ও তিনটি

বাচ্চা– এদের কার সঙ্গে কী সম্পর্ক সেটা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ প্রশ্নটা সব সময় মাথার মধ্যে ঘুরবেই।

মানবেন্দ্র নজর ফিরিয়ে দেখলেন, তার সুপ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিস্বাদ। ঠেলে সরিয়ে রাখলেন সেটা। এর পরবর্তী খাবারগুলো কোনওটাই ভাল করে খেলেন না তিনি। পেটে খিদে রেখেই উঠে পড়লেন।

আপনাদের কাগজটা।

অসীম রায়চৌধুরী কৃত্রিম ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, ও, আচ্ছা, ঠিক আছে! আপনি কাগজটা এখন রাখতে পারেন, আমরা তো এখন পড়ছি না।

না, আমার হয়ে গেছে।

আপনি কি আজই চলে যাচ্ছেন?

মানবেন্দ্র একটু বিস্মিত হলেন। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন! তার চেহারার মধ্যে কি কোনও রকম বিদায় নেবার ভাব আছে?

না, আমি আরও দিন পনেরো থাকব।

দিন পনেরো!

এই বিস্ময়ের উক্তি অসীম রায়চৌধুরীর নয়, অন্য সুদর্শন পুরুষটির। সে আবার বলল, আপনি এখানে আরও পনেরো দিন থাকবেন?

অর্থাৎ ওরা জানতে চায়, এখানে দেখবার মধ্যে আছে তো শুধু একটা মন্দির, অনেকে এবেলা এসেও-বেলা চলে যায়, কেউ কেউ এক রাত বা দু'রাত থাকে। কিন্তু পনেরো দিন?

আমি এমনিই সময় কাটাতে এসেছি। অনেকটা বিশ্রাম নেবার জন্য।

অসীম রায়চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি গৌতম ব্যানার্জি, ইনি হিরন্ময় বোস, আর ইনি অনুরাধা ব্যানার্জি, ইনি মানসী রায়চৌধুরী। আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার মজুমদার, মানবেন্দ্র মজুমদার।

কাঁটা চামচ থাকা সত্ত্বেও মুর্গির ঝোল ও ভাত সকলে হাত দিয়েই খাচ্ছিল। এঁটো হাতে নমস্কার করা যায় না। তবু ওরই মধ্যে কেউ কেউ দু'হাতের মাঝখানে একটু দূরত্ব রেখে নমস্কারের ভঙ্গি করল।

মানবেন্দ্র একমাত্র লক্ষ্য করছিলেন সেই নারীটিকে, যার মুখ তিনি আগে দেখতে পাননি। এর নাম মানসী রায়চৌধুরী, হালকা হালকা শ্যামলা রঙ, পাতলা চেহারা, মুখখানা শান্ত ধরনের। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এই সব মেয়ে বাইরের লোকের সামনে কক্ষনও রাগে না।

পদবি শুনেই মানবেন্দ্র বুঝে নিয়েছেন কার সঙ্গে কী সম্পর্ক। এর মধ্যে হিরন্ময় বসুই আলাদা। সে এবার প্রশ্ন করল, মানবেন্দ্র মজুমদার? মানে আপনিই কি...

মানবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, আপনারা তো বোধহয় বেশি দিন থাকছেন না। তা হলে শুধু মন্দির দেখেই চলে যাবেন না, এখানে একটা চমৎকার ঝরনা আছে, সেটাও দেখবার মতো।

বাচ্চাদের মধ্যে এক জন একটা ঝোলের বাটি উলটে ফেলেছে। সব মনোযোগ সেই দিকে ঘুরে গেল। মানবেন্দ্র খবরের কাগজটা রেখে আর কোনও কথা না বলে সরে এলেন সেখান থেকে। আর একবার তাকিয়ে দেখলেন শ্যামলা ধরনের ছিপছিপে মেয়েটির দিকে। কীরকম যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে একে দেখে। এর বসে থাকার ভঙ্গি, তাকানো কিংবা টেবিলের ওপর বাঁ-হাতের পাতাটা মেলে রাখা–এ-সবই অন্য রকম। তিনি মনে

মনে বললেন, এই মেয়েটি এসেছে তার শান্তি নষ্ট করতে। যদিও মেয়েটি তার দিকে দু'এক পলকের বেশি তাকায়নি।

খাবার ঘরের দরজার কাছে এসে মানবেন্দ্র আর একবার তাকালেন। মানসী নামের মেয়েটির মুখ অন্য দিকে ফেরানো, চোখাচোখি হল না। তবু মানবেন্দ্রর মনে হল, মেয়েটিকে যেন চেনা চেনা লাগছে। অথচ মুখটা একেবারেই চেনা নয়, কোনও মেয়ের মুখ মানবেন্দ্র একবার দেখলে আর ভোলেন না, কিন্তু এই মেয়েটির সবকিছু মিলিয়ে যেন একটা পূর্ব পরিচয়ের আভাস।

মানবেন্দ্র তালা খুলে ঢুকলেন নিজের ঘরে। জানলা খুলেই রেখে গিয়েছিলেন, তাই বন্ধ ঘরের ভ্যাপসা ভাবটা নেই। প্রথমেই তিনি খুঁজলেন মহারানিকে। মথটা কিন্তু তখনও ঘুলঘুলির পাশে ঠিক সেই রকম ভাবেই বসে আছে। মাফিয়া কিংবা শাইলককে দেখা যাচ্ছেনা, কিন্তু বেহুলা নিয়ন টিউবের ধার ঘেঁষে শুয়ে আছে চুপ করে। আশ্চর্য ব্যবহার তো মহরানির, তার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই? শুধু নিজের সৌন্দর্যটুকু মেলে ধরে থাকাই তার কাজ? মানবেন্দ্র একটু বিরক্ত ভাবে বললেন, কী হচ্ছে কী? এই খুকি, একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো না।

মানবেন্দ্র এ-দিকও-দিক তাকিয়ে একটা খোলা খিল খুঁজে পেলেন। সেটা তুলে মথটার খুব কাছে গিয়ে ঠুকতে লাগলেন। মথটা আবার একবার উড়ে গিয়ে অন্য দেয়ালে বসল। হঠাৎ খুব মায়া হল মানবেন্দ্রর। তিনি বুঝতে পারলেন, এই মথটির মৃত্যু তাকে নিজের চোখে দেখে যেতে হবে।

মানবেন্দ্র আবার একটা চুরুট ধরালেন। চুরুটের স্বাদ তার একটুও ভাল লাগে না। মুখটা তেতো হয়ে থাকে। ইদানীং তিনি সিগারেট ছেড়ে স্বেচ্ছায় চুরুট ধরেছেন। আজকাল নানা ব্যাপারে নিজেকে কষ্ট দিতেই তার ভাল লাগে। একমাত্র এই উপায়েই তিনি তার অসুখটা সারাতে পারবেন।

মানবেন্দ্রর আসল অসুখটার নাম পাগলামি। এমনিতে তার শরীর যথেষ্ট সুস্থ। স্বাভাবিকতা ও পাগলামির মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম সীমারেখা আছে, তিনি কিছু দিন হল সেই সীমারেখাটার ঠিক ওপরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কখনও কখনও একটু ঝুঁকে যেতেন অন্য দিকে। হঠাৎ এমন এক একটা কাজ করে ফেলছিলেন, যে সম্পর্কে আগের মুহূর্তেও কিছু চিন্তা করেননি। কিংবা চোখে ভুল দৃশ্য দেখা। কোনও সুস্থ মানুষ এরকম করেনা, এমনকী শিল্পীরাও না। কোনও ডাক্তার বলেনি, মানবেন্দ্র নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন এটা। নিজেই নিজের চিকিৎসা করছেন।

প্রথম এই ব্যাপারটা টের পান মাস ছয়েক আগে। কলেজ স্ট্রিটে একটা বইয়ের দোকান বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিলেন। সন্ধের সময় হঠাৎ যেন একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ায় ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। ট্রাম ও বাস বদলাবদলি করে চলে এলেন মানিকতলায়। ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে একটু হেঁটে ঢুকে পড়লেন একটা গলির মধ্যে। গলির শেষ বাড়িটার সদর দরজা খোলাইছিল। মানবেন্দ্র হন হন করে ঢুকে গিয়েছিলেন ভেতরে। মাঝখানে একটা উঠোন, তার ও-পাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশেই যে-ঘরটা, তার সামনে এসে মানবেন্দ্র পা থেকে চটি খুলে রাখলেন এক পাশে। তারপর দরজাটা ঠেললেন। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে ডেকেছিলেন –মা মা।

দরজা খোলেনি।

মানবেন্দ্র আরও জোরে ডেকেছিলেন।

সারা বাড়ি গম গম করে উঠেছিল তার মা মা ডাকে।

একটু বাদে দরজা খুলেছিল এক জন যুবতী, যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে। মানবেন্দ্র তাকে দেখেও বলেছিলেন, মা, এতক্ষণ দরজা খুলছিলে না কেন!

যুবতীটির চোখে এক পৃথিবীব্যাপী বিস্ময়। প্রথমটায় কথা বলতে পারেনি। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কে?

মানবেন্দ্রর চোখে নিবিড় বিরক্তি। তিনি চিনতে পেরেছেন যে, এই মেয়েটি তার মা নয়। তবে এই মেয়েটি এখানে কেন? তিনি পালটা প্রশ্ন করছিলেন, আপনি কে? আমার মা কোথায়?

ততক্ষণে বাড়ির আরও অনেকগুলি ঘরের দরজা খুলে গেছে। কয়েক জন কৌতূহলী মানুষ এগিয়ে এসেছে কাছে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনার কী চাই এখানে?

মানবেন্দ্র বলেছিলেন, কী মুশকিল, আমরা তো এই ঘরের থাকি। আমার মা কোথায় গেল?

সেই সময় পায়জামা ও গেঞ্জি পরা রোগা মতো একজন লোক দো-তলা থেকে নেমে এসে বলল, আপনি, মানে চেনা চেনা লাগছে, তুই মানু না?

মানবেন্দ্র বললেন, জীবন!

সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোর কেটে গেল। এ কী অসম্ভব একটা কাণ্ড করেছেন তিনি! এই বাড়িতে ছাব্বিশ বছর আগেভাড়া থাকতেন মানবেন্দ্ররা। তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। সিঁড়ির পাশের এই ঘরটিতে থাকতেন তার মা। বছর তিনেক বাদেই এ বাড়ি ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন শোভাবাজারে। কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যে এ গলিতেও আর কখনও আসেননি। অথচ আজ ঠিক যেন নিজের বাড়িতে ফিরছেন, এইভাবে দরজার বাইরে চটি খুলে রেখে ভেতরে ঢুকতে চাইছিলেন। এই সময়-বিস্মৃতি কী করে হল?

এত দিনে সেই বাড়ির অধিকাংশ বাসিন্দাই পালটে গেছে। হয়তো সন্দেহের বশে লোকজনেরা তাকে মারধোরই করত, একমাত্র বাড়িওয়ালার ছেলে জীবন, তার বাল্যবন্ধু, কোনও ক্রমে চিনতে পেরেছে।

জীবন বলল, কী ব্যাপার রে, তুই এত দিন বাদে?

মানবেন্দ্র বিমূঢ় ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, কী জানি, আমি তো জানি না, আমার সব ভুল হয়ে গেছে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো ভাল করে মুছে ধাতস্থ হলেন। তারপর অচেনা যুবতীটির উদ্দেশে হাত জোড় করে বলেছিলেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

মানবেন্দ্রর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিটি এমনই বিনত ও কাতর ছিল যে যুবতীটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, না না, ওতে আর কী হয়েছে।

যবুতীটির ডান চোখের পাশে একটা বড় তিল।

সেটা দেখে আবার কেঁপে উঠেছিলেন মানবেন্দ্র। ছাব্বিশ বছর আগে মানবেন্দ্র যখন এই ঘরটাতে থাকতেন, তখন তার মায়ের বয়স ছিল ওই যুবতীটিরই প্রায় সমান। একই ধরনের চেহারা, এবং মায়ের ডান চোখের পাশে ঠিক ওই রকমই একটা তিল।

মানবেন্দ্র অবশ্য এই ব্যাপারটার ওপর বেশি গুরুত্ব দিলেন না। তার মায়ের সঙ্গে ওই যুবতীটির চেহারার আপাত সাদৃশ্য কাকতালীয় গোছের। এ-রকম হতেই পারে। বাল্যবন্ধু জীবন তাকে নিয়ে গিয়ে বসাতে চায়, অনেক প্রশ্ন করতে চায়। কিন্তু মানবেন্দ্র এত লজ্জা পেয়েছিলেন যে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাননি। কোনও রকমে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে যাচাই কবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ওখানে গিয়েছিলেন কেন? বইয়ের দোকানের আড্ডা ছেড়ে হঠাৎ উঠে পড়ে ছাব্বিশ বছর

আগেকার সময়ে ফিরে যাওয়ার মধ্যে কী যুক্তি থাকতে পারে? তিনি কোনও উত্তর খুঁজে পাননি।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটে এর কয়েক দিন পরেই। মানবেন্দ্র সন্ধেবেলা চৌরঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ একটা চলন্ত ট্যাক্সির দিকে তার চোখ পড়ল। তিনি দেখলেন, জানলার পাশে বসে আছে চঞ্চল। তিনি বিস্ময়ের হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্যাক্সিটা হুস করে বেরিয়ে গেল।

মানবেন্দ্রর মনটা আনন্দে ভরে গিয়েছিল। চঞ্চল তা হলে ফিরে এসেছে। বছর দশেক আগে চঞ্চল চলে গিয়েছিল আফ্রিকায়। চঞ্চল ছিল ছেলেবেলায় তার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি-অখ্যাতি-সার্থকতা আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু অনেক কমে গেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সরে গেছে দূরে। টেনশানমুক্ত হয়ে কথা বলা যায়, এমন মানুষ প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। একমাত্র চঞ্চল সম্পর্কেই এ প্রশ্ন আসে না। কিন্তু চঞ্চল সেই যে কিছু টাকা রোজগার করে ফিরে আসার ইচ্ছে নিয়ে চলে গেল নাইজিরিয়ায়, আর ফিরল না। তারপর থেকে নানা দেশে ঘুরছে। চিঠি লেখার স্বভাব চঞ্চলের কোনও কালেই নেই। কদাচিৎ দু'একটা পোস্টকার্ড লেখে। সেই চঞ্চল তা হলে ফিরেছে এতদিন পর!

মানবেন্দ্র আশা করেছিলেন সেইদিনই বা পরের দিন চঞ্চল তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ট্যাক্সিতে চঞ্চলের পাসে একটি মেয়ে ছিল। বাঙালি মেয়ে। মানবেন্দ্র তার মুখটা ভাল করে দেখতে পাননি। সুতপা হতে পারে। সুতপার বিয়ে হয়ে গেছে। চঞ্চলও জানে সে-খবর। সুতপার বিয়েতে সে নাকি কোনও আপত্তিও করেনি। কিন্তু চঞ্চলকে দেখলে সুতপা যে সব কিছু অগ্রাহ্য করে আবার চলে আসবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অসম্ভব তীব্র ভালবাসা ওদের।

সেই সন্ধেবেলাই দু'জন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় মানবেন্দ্র বলেছিলেন, জানো, চঞ্চল ফিরে এসেছে।

ওরাও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। চঞ্চলের অমলিন স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ভালবাসে, সকলেই তাকে মনে রেখেছে।

কিন্তু দুদিনের মধ্যেও চঞ্চল তার খোঁজ করলনা। মানবেন্দ্র রীতিমত আহতও অবাক হয়েছিলেন। তবু তিনি নিজেই খোঁজ করতে চেয়েছিলেন চঞ্চলের। চঞ্চল কোথায় উঠেছে তিনি জানেন না। চঞ্চলের বাবা-মা এখন থাকেন এলাহাবাদে। চেনাশুনো লোকদের কাছে চঞ্চলের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কেউ এ পর্যন্ত চঞ্চলকে দেখেনি।

এরপর মানবেন্দ্র আর এক দিন দেখলেন, চঞ্চল ভবানীপুরে একটি সিনেমা হলে ঢুকছে। সঙ্গে একটি মেয়ে, সুতপারই মতো। সাহেবি কায়দায় চঞ্চল মেয়েটির কোমরে হাত দিয়ে আছে। চঞ্চল সব পারে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে চঞ্চল একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটি অচেনা মেয়েকে বলেছিল, তুমি যদি আমাকে একটা গান শোনও, আমি তোমাকে দশবার চুমু খেতে পারি। গান না শোনালে কিন্তু চুমু পাবে না, আগেই বলে দিচ্ছি!

মানবেন্দ্র রাস্তার ওপারে ছিলেন, এ-দিকে আসতে আসতেই চঞ্চল মেয়েটিকে নিয়ে সিনেমা হলে ঢুকে গেল। শো শুরু হয়ে গেছে। মানবেন্দ্র একবার ভাবলেন, খানিকটা ঘুরেফিরে এসে ঠিক শো ভাঙার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চঞ্চলকে ধরবেন। কিন্তু যদি ফস্কে যায় এই ভয়ে মানবেন্দ্র একটা টিকিট কেটে নিজেও ঢুকে পড়লেন সেই সিনেমায়। অন্ধকারে তক্ষুনি খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ইন্টারভ্যাল কিংবা ছবি শেষ হবার পরেও চঞ্চলকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। সে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। কিংবা চঞ্চল কি ইচ্ছে করেই মানবেন্দ্রকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে? সেরকম কোনও কারণই নেই, চঞ্চলের সঙ্গে তার কোনওদিন মন কষাকষি হয়নি। একমাত্র চঞ্চলই এখনও মানবেন্দ্রর ওপর হুকুম করে কথা বলতে পারে। তবু কলকাতায় এসে চঞ্চল তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না, এ কী হতে পারে? মানবেন্দ্রর মনে একটা সূক্ষ্ম অভিমান জেগেছিল। শুধু শুধু তাকে একটা বাজে সিনেমা দেখতে হল।

চঞ্চলকে তিনি তৃতীয় বার দেখেছিলেন ওই সিনেমা হলের কাছেই বাস স্টপে। এবার মানবেন্দ্রই ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ চঞ্চলের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল, চঞ্চল হাসল পরিচিত ভঙ্গিতে। এখন সে একা, সঙ্গে সুতপা নেই।

মানবেন্দ্র চেঁচিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলেছিলেন, রোককে রোককে। ট্যাক্সি খানিকটা এগিয়ে থামল। মানবেন্দ্র ঝট করে দরজা খুলে নেমে দৌড়ে এলেন। দৈত্যের মতো একটা দোতলা বাস তার সামনে। এত কাছে মৃত্যু, মানবেন্দ্র আর কিছু চিন্তা করার বদলে শুধু ভাবলেন, মুখের ওপর দিয়ে চাকাগুলো চলে গেলে চঞ্চলও আর তাকে চিনতে পারবে না। হাত দিয়ে মুখটা আড়াল করে নিরুপায়ের মতো তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বাসটা মানবেন্দ্রকে দয়া করে চাপা দিল না, চলে গেল পাশ কাটিয়ে। চোখ থেকে হাত নামিয়ে মানবেন্দ্র দেখলেন চঞ্চল নেই। হয়তো ওই বাসেই চঞ্চল উঠে গেছে। চঞ্চল কি বুঝতে পারেনি যে মানবেন্দ্র ট্যাক্সি থামাবেন! এ কখনও হতে পারে?

কিন্তু পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবরা এর মধ্যে বলতে শুরু কবেছে যে চঞ্চল কলকাতায় আসেনি। আর কেউ তাকে দেখেনি। কোথাও তার কথা শোনা যায়নি। চঞ্চলের মতো ছেলে কলকাতায় এলে এক দিনের মধ্যেই সেকথা রটে যেত। নিজেকে গোপন করার ক্ষমতা চঞ্চলের নেই। মানবেন্দ্র নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন।

একথা শুনে রীতিমতো চটে গিয়েছিলেন মানবেন্দ্র। তিনি কি নির্বোধ না ছেলেমানুষ যে, তিন তিনবার ভুল দেখবেন? চঞ্চলকে কি তিনি অন্য কারুর সঙ্গে ভুল করতে পারেন?

অনেকের কাছে খোঁজ নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন সুতপার কাছে। তার মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকেছিল। এ-রকম কথা তিনি লোকের মুখে শুনেছেন বা বইতে পড়েছেন যে, দূর বিদেশে কোনও লোক যদি হঠাৎ মরে যায়, তাহলে ঠিক সেই সময়েই তার কোনও নিকট আত্মীয় বা বন্ধু দেখতে পায় তাকে। মানবেন্দ্র কোনও দিন এটা বিশ্বাস করেননি, তবু একটু ভয় ভয় করছিল।

সুতপা রেগে গিয়েছিল মানবেন্দ্রর ওপরে। ঝাঁজালো গলায় বলেছিল, আমি জানি, তুমি এত দিন পরে কেন এসেছ। তুমি এমনিতে কক্ষনও আমার বাড়িতে আসো না। আজ এসেছ চঞ্চলের খোঁজ নিতে। তুমি জানতে এসেছ ও আমাকে চিঠি লেখে কিনা! হ্যাঁ, আমার স্বীকার করতে কোনও লজ্জা নেই, ও আমাকে এখনও চিঠি লেখে। আমার স্বামীও সেকথা জানে। কিন্তু সে কখনও ওর চিঠি পড়ে দেখতে চায় না।

চঞ্চলের শেষ চিঠিটা আমাকে দেখাবি?

না!

মানবেন্দ্রর ইচ্ছে হয়েছিল উঠে গিয়ে সুতপারে সুন্দর মুখে ঠাস করে এক চড় মারেন। তখন তার মনের অবস্থা এই রকম।

তিনি হাতটা বাড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, দে!

বলছি তো দেব না!

মানবেন্দ্র একটুখানি সময় নিলেন রাগ সামলাবার জন্য। তারপর ক্লান্তভাবে বলেছিলেন, সুতপা, কী করছিস কী! আমি চঞ্চলের একটা চিঠি পড়তে পাব না, আমি কি এতই দূরে সরে গেছি?

সুতপা মানবেন্দ্রর আপন মাসতুতো বোন। বাল্যকালে ওরা অনেক সময় এক খাটে শুয়ে ঘুমিয়েছে। মানবেন্দ্রর জীবনের প্রথম চুম্বন ওই সুতপাকেই।

সুতপা শেষ পর্যন্ত চিঠিখানা দিয়েছিল। কুয়েত থেকে লিখেছে চঞ্চল। দারুণ দামি কাগজ, সোনার জলে ওর নাম লেখা। অদ্ভুত সেই চিঠির ভাষা– সুতপা, আমার নতুন বান্ধবীর নাম ক্যারেন। নামটা মোটেই আমার পছন্দ নয়। লোকে আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে জানে, কিন্তু আমরা বিয়ে করিনি। ব্যাপারটা সামান্য বিপজ্জনক। যাই হোক, আমি কি ওকে

সুতপা নামে ডাকতে পারি? তোমার অনুমতি চাই। শিগগিরই লিবিয়াতে ফিরব। মানুর খবর কী? তোমার চোখের ব্যথাটা কমেছে? ইতি তোমারই চঞ্চল।

মানবেন্দ্র চিঠিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। এক সময় তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। তিনি চঞ্চলের কথা ভাবছেন না, তিনি ভাবছেন নিজের কথা। চিঠির তারিখ মাত্র আট দিন আগের। মানবেন্দ্র তারও কয়েকদিন আগে চঞ্চলকে প্রথম কলকাতায় দেখেছেন। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য।

সুতপা মানবেন্দ্রর বাহুতে হাত রেখে আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, এ কী, তুমি কাঁদছ কেন মানুদা! কী হয়েছে? চঞ্চল তোমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেছে?

আমি কয়েকদিন আগে চঞ্চলকে দেখেছিলাম।

কোথায়?

স্বপ্নে নয়, রাস্তায়।

তুমি পাগল হয়েছ? চঞ্চল এসে থাকলে কারুর সঙ্গে দেখা না করে চলে যেতে পারে?

সুতপাই পাগল কথাটা প্রথম উচ্চারণ করেছিল। তারপর থেকে সেটা মানবেন্দ্রর মাথায় গেঁথে যায়। পুরো ব্যাপারটাই তার পাগলামি না চোখের ভুল? কিন্তু এরকম চোখের ভুল তার হবে কেন? আগে তো কখনও হয়নি।

মা, প্রিয় বন্ধু, তারপর ঈশ্বর। এরপর মানবেন্দ্র এক দিন ঈশ্বরকে দেখলেন। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের ঈশ্বর। সে-দিন মানবেন্দ্রকে একটা মিটিং-এ যেতে হয়েছিল চন্দ্রননগরে। বড্ড বেশি কথা বলতে হয়েছে। অসহ্য গরমের মধ্যে সারাটা দিন কেটেছে বেশ কষ্টে। রাত্তিরে অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না। মানবেন্দ্র নিজের ঘরে একা শুয়েছিলেন। আলো নেভানো, তবু রাস্তায় আলো এসে অন্ধকারকে আবছা করে দেয়।

মানবেন্দ্র দেখলেন, তার ঠিক চোখের সিধে দেয়ালের সামনে শঙ্খ-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু এসে দাঁড়িয়ে আছেন। একেবারে ছবির মতো। মানবেন্দ্রর ঘরে একটিমাত্র ক্যালেন্ডারে বিদেশি নিসর্গ। চোখের সামনে পূর্ণাঙ্গ বিষ্ণুমূর্তি দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলেন। হাত বুলিয়ে খাটের তলা থেকে টেনে আনলেন সিগারেট-দেশলাই। অ্যাশট্রে নেই কাছাকাছি, তাতে কোনও ক্ষতি নেই, মেঝেতে ছাই ফেলা যায়। দেশলাইটা জ্বেলে আবার চিত হয়ে সেই আলোয় দেখলেন, বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ চকচক করছে।

ভিশান্ দেখা মানবেন্দ্রর বহু দিনের অভ্যেস। এখনও যে-সব রাত্তিরে তিনি মদ্যপান করেন না, ঘুম আসতে একটু দেরি হয়, চোখ বুজলেই চোখের সামনে অনেক দৃশ্য ভেসে ওঠে। সাধারণত নানা রকম ডিজাইন অথবা যে-সব জায়গায় মানবেন্দ্র কখনও যাননি, যে-সব রাস্তা বাড়ি তিনি কক্ষনও চোখে দেখেননি, সেই সব দেখতে পান। দৃশগুলো পর পর বদলে যায়, অদ্ভুত আনন্দ পান তাতে মানবেন্দ্র। তিনটি গল্প এবং একটি উপন্যাসের কাহিনিও তিনি পেয়েছেন এইভাবে।

কিন্তু সে তো চোখ বুজে দেখা। সেই রাতে মানবেন্দ্র সম্পূর্ণ চোখ খুলে দেয়ালের সামনে বিষ্ণুকে দেখতে পেয়েছিলেন। পৌরাণিক কাহিনির সমস্ত বেশভূষা নিয়ে।

বাড়ির ছাদটা খারাপ। ছাদে বৃষ্টির জল জমলে ঘরের দেয়ালগুলিতেও চুঁইয়ে এসে নোনা ছাপ পড়ে। দেয়ালের সেই সব ছাপ কিংবা ফাটাফুটি থাকলে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক রকম মূর্তি কল্পনা করা যায়।

মানবেন্দ্র উঠে আলো জ্বাললেন। হ্যাঁ, ঠিকই দেয়ালে নোনা ছাপ পড়েছে। নিতান্তই আঁকাবাঁকা দাগ, সেদিকে তাকিয়ে কোনও মানুষ বা জীবজন্তুর চেহারাও কল্পনা করা যায় না। মানবেন্দ্র হাত দিয়ে দেয়ালের সেই জায়গাটা ঘষে দিলেন। তারপর আবার আলো নিভিয়ে এসে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

এবারও দেখতে পেলেন বিষ্ণুমূর্তি। মানবেন্দ্র মাথা ঠাণ্ডা করে সিগারেট টানতে লাগলেন। হ্যাঁ, চোখের ভুল তো নিশ্চয়ই। কিন্তু বিষ্ণুমূর্তি কেন?

যৌবনের শুরু থেকেই মানবেন্দ্র ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। তিনি কখনও সরবে নাস্তিকতা প্রচার করতেও যাননি অবশ্য। ব্যাপারটা সম্পর্কেই তিনি নির্লিপ্ত থাকতে চান। তবে তার পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা কোনও রকম পুজোআচ্চা কিংবা নামাজ-প্রার্থনায় অংশ নেয়, তাদের সম্পর্কে তার মনের মধ্যে একটু করুণা বোধ আছে। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে নিজের চেষ্টায় ওপরে উঠে এসেছেন, কোনও দিন কারুর সাহায্য নেননি, ঠাকুর-দেবতাদেরও সাহায্য চান না। তিনি জানেন, এই জীবন একটাই। এবং মুক্তি সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ নেই।

তাহলে তার দৃষ্টিবিভ্রমে বিষ্ণুমূর্তি কেন? এর তো কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না। তবু তিনি সিগারেটটা শেষ করার পর উঠে বসলেন। আবার ভাল করে তাকালেন। এখনও বড় স্পষ্ট।

ঘরে কোনও ভদ্রলোক এলে তাকে যেমন খাতির করা উচিত সেই রকম ভাবে হাত জোড় করে মানবেন্দ্র বিনীত গলায় বললেন, নমস্কার। আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

কোনও উত্তর নেই।

মানবেন্দ্র প্রশ্নটা তিনবার করলেন।

তারপর তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে দেয়ালের গায়ে দুম করে এক লাথি মেরে বললেন, শালা, ইয়ার্কি করার আর জায়গা পাওনি।

লাথিটা বেশ জোরেই মেরেছিলেন। মানবেন্দ্রর পায়েই লেগেছিল খুব। হাঁটুটা চেপে ধরে তিনি ঘরের মেঝেতে কিছুক্ষণ বসেছিলেন গুম হয়ে। তিনি বার বার এ-রকম ভুল দেখছেন কেন? হঠাৎ নমস্কারই না করলেন কেন, লাথি মারতেই-বা গেলেন কেন? এই কি পাগলামির লক্ষণ?

মানবেন্দ্রর মুখটা কুঁকড়ে গিয়েছিল। চোখ দুটোতে কান্নার মতো জ্বালা। তিনি ভেবেছিলেন, না না, আমাকে পাগল হলে চলবে না। আমি নিজেই নিজেকে বাঁচাব।

৩-৪. সন্ধের পর

মানবেন্দ্র আবার ঘর থেকে বেরুলেন সন্ধের পর। বেশ শীত পড়েছে। শালটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তিনি মন্থর গতিতে হাঁটছিলেন। বাগানে চেয়ার পেতে ওরা বসে আছে। ওদের সঙ্গে যাতে চোখাচোখি না হয়, সেই জন্য তিনি তাকিয়ে আছেন অন্য দিকে।

একটি মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। জড়তাহীন স্বচ্ছ গলা। নারী দু'জনের মধ্যে কোন জন গায়িকা– সেটা জানার কৌতূহল ছিল মানবেন্দ্রর। রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি পছন্দ করেন না। ত্রিসপ্তকের মাত্র একটি সপ্তকে ওই গানগুলি গাওয়া হয় –একে সঙ্গীত বলে না। তার সপ্তকে তুলতে হলেই অধিকাংশ গায়ক-গায়িকা ফলসেটো ব্যবহার করে প্রকাশ্যে তাই শোনানো হয়, রেকর্ড হয়, আশ্চর্য ব্যাপার।

বারান্দাটুকু পার হতে হতে মানবেন্দ্র গানটির চারটি লাইন শুনলেন–

আমারে করো তোমার বীণা,
লহো গো লহো তুলে
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি
মোহন অঙ্গুলে।
কোমল তবু কমল করে
পরশ করো পরাণ-পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া ।
তব শ্রবণমূলে।

শুনতে শুনতে মানবেন্দ্রর চোখের সামনে ভেসে উঠল ৩৩ সংখ্যা। তিনি ভুরু কোঁচকালেন। অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করলেন। এই ৩৩ সংখ্যাটা বিরাট বড় হয়ে তার পথ জুড়ে যেন দাঁড়াল। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, যাও! কিন্তু গেল না!

মানবেন্দ্রর স্মৃতিশক্তি একসময় ছিল অসাধারণ। মাঝখানে কয়েকটা বছর অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও সে-ক্ষমতা মাঝে মাঝে ফিরে আসে। এ-রকম ফিরে এলেই তিনি বরং বিরক্ত হন। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি সমস্ত অস্ত্রের কথা ভুলে যাবেন।

মানবেন্দ্র আসলে দেখতে পাচ্ছেন গীতবিতানের একটি পৃষ্ঠা, তার ঠিক মাঝখানে ৩৩ নম্বর গান, আমার করো তোমার বীণা..। এর ঠিক নীচেই ভালোবেসে, সখী, নিভৃত যতনে.. সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গান তিনি পছন্দ না করলেও, এককালে শুধু সাহিত্যগুণের জন্য গোটা গীতবিতানটা প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

পৃষ্ঠাটার ওপরে লেখা আছে প্রেম। এটা প্রেম বিষয়ক গান। এ আবার কী ধরনের প্রেম? আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে-এই বর্ণনা কি শারীরিক? একটি মেয়েকে কোলের ওপর বসিয়ে তার উরু ও বুকের ওপর দুটি হাত রাখলে অনেকটা বীণার মতোই মনে হতে পারে বটে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ সম্পাদক কি এ-রকম শারীরিক বর্ণনা দেবেন? না। সেই জন্যই লিখেছেন, পরশ করো পরাণ-পরে। শরীর স্পর্শ করার ব্যাপার নয়, পরাণের ওপর আঙুল রাখতে বলছেন। একটা উদ্ভট ব্যাপার। সত্যি সত্যি একটি নারীকে বীণা কিংবা তম্বুরার মতো কোলের ওপর বসানো কি এর চেয়ে অনেক সুন্দর দৃশ্য নয়? উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণমূলে-এ-রকম একটা বাজে লাইন কল্পনাও করা যায় না। শ্রবণমূলে? এখানে শ্রবণমূলে মানে ঠিক কী?

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে মানবেন্দ্র টুরিস্ট লজের অফিস ঘরে ঢুকছিলেন, এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ পেলেন।

আচ্ছা একটু শুনুন।

মানবেন্দ্র মুখ ফেরালেন। হিরণ্ময় বসু। প্রত্যেক দলের মধ্যেই এক জন বোকা লোক থাকে। ওদের দলের মধ্যে এ হচ্ছে সেই ভিলেজ ইডিয়েট, মানবেন্দ্র এক নজরে দেখেই বুঝেছেন।

আমাকে কিছু বলছেন?

হিরণ্ময় বসু বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনিই কি সেই মানবেন্দ্র মজুমদার, মানে রাইটার?

মানবেন্দ্র একটু ইতস্তত করলেন। মিথ্যে কথা চট করে তার মুখে আসে না। তিনি নির্লিপ্ত ভাবে বললেন, হ্যাঁ।

হিরন্ময় বসুর মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে বলল, আমি ঠিকই ধরেছি। আমি আগেও দুএকবার দেখেছি আপনাকে।

হিরন্ময় বসু গলা চড়িয়ে বাগানে বসে থাকা দলটির উদ্দেশে বলল, এই অসীম, তুই বাজিতে হেরেছিস।

মানবেন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, পুলিশে গ্রেপ্তার করা আসামির মতো। তিনি বুঝতে পেরেছেন, আজ আর তার সান্ধ্যভ্রমণ হবে না।

হিরন্ময় বসু বলল, আসুন না, আমাদের সঙ্গে একটু বসবেন। আমরা চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

যে-ব্যাপারে মানবেন্দ্রর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, তাতেও আজকাল তিনি আগ্রহে রাজি হয়ে যান। ইদানীং নিজেকে কষ্ট দেবার ব্রত নিয়েছেন কিনা।

তিনি হাসিমুখে বললেন, চলুন।

অন্য পুরুষ দুজন মানবেন্দ্রকে অত্যন্ত সম্মান দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হিরন্ময় দৌড়ে বারান্দা থেকে অতিরিক্ত একটা চেয়ার এনে বলল, বসুন, আপনি এখানে বসুন।

মানবেন্দ্রর চেয়ার ঠিক শ্যামলা রঙের ছিপছিপে মেয়েটির মুখোমুখি। সে-ই গান গাইছিল। মানসী রায়চৌধুরী। চোখের দৃষ্টি খুব স্নিগ্ধ। মেয়েদের মুখের কয়েকটি বিভিন্ন প্যার্টান আছে। যে-কোনও মেয়েকে দেখলেই অনায়াসে বলা যায়, একে অনেকটা অমুকের মতো দেখতে। যেমন অনুরাধা ব্যানার্জির মুখের আদল অনেকটা দীপার ছোট বোন জয়ার মতো। কিন্তু মানসী রায়চৌধুরীর মুখ দেখে অন্য কোনও মেয়ের কথা মনে পড়ল না। অথচ খুব যেন চেনা চেনা। এটা কী করে হয়?

মানসী রায়চৌধুরীর উদ্দেশে মানবেন্দ্র ভদ্রতা করে বললেন, আমি আসার জন্য আপনার গান বন্ধ হয়ে গেল।

মানসী নম্রভাবে বলল, আমি এমনিই গাইছিলাম।

গৌতম ব্যানার্জি বলল, আমি আপনার অনেক লেখা পড়েছি। কখনও আপনাকে দেখিনি। তাই হিরন্ময় যখন বলল, ঠিক বিশ্বাস করিনি।

অসীম রায়চৌধুরী বলল, আমি একদমই বিশ্বাস করিনি।

এসব ক্ষেত্রে যা বলা উচিত, মানবেন্দ্র সেই বাঁধাধরা কথাটাই বললেন। লেখার সঙ্গে লেখকদের চেহারা একদমই মেলে না। তাছাড়া–।

একটু থেমে, সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মানবেন্দ্র আবার বললেন, আমার নামে এক জন আধুনিক গায়ক আছেন, অনেকে আমার নাম শুনে তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন।

গৌতম ব্যানার্জি বলল, না, আমরা সেকথা ভাবিনি। চেহারার জন্যও না। মানে, হঠাৎ এ-রকম জায়গায় একজন লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কী-রকম যেন অবিশ্বাস্য লাগে। তাছাড়া আমরা ভেবেছিলুম, আপনার আরও অনেক বেশি বয়েস হবে। লেখকদের তো

আমরা সাধারণত খুব প্রবীণ মনে করে থাকি। আমার সঙ্গে শৈলজানন্দ আর অচিন্ত্যকুমারের আলাপ আছে।

ওঁরাও একসময় তরুণ ছিলেন এবং তরুণ বয়েস থেকেই বিখ্যাত। আর আমার বয়েসটাও কম নয়।

হিরন্ময় বসু মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, গৌতমও এক সময় কিন্তু লিখত-টিখত।

গৌতম অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বলল, না না, সে কিছু নয়।

মানবেন্দ্র একটু অবাক হলেন। গৌতম অত্যন্ত সুশ্রী যুবা পুরুষ। চওড়া কাঁধ, টানা টানা চোখ, রঙ অত্যন্ত ফর্সা হলেও বোক বোকা ভাবটি নেই, দাড়ি কামাবার পর গালে নীল রঙের আভা পড়ে। অত্যন্ত ভদ্র। মার্জিত কথা বলার ভঙ্গি। দেখলেই বোঝা যায়, জীবনে খুব সার্থক, ভাল চাকরি কিংবা নিজস্ব ব্যবসা আছে, রূপসী স্ত্রী। এই রকম মানুষ তো সাধারণত সাহিত্য-টাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয় না। বাংলা সাহিত্য জিনিসটাই তো এখন মধ্যবিত্তদের ব্যাপার।

অনুরাধা ব্যানার্জি পট থেকে ঢেলে এককাপ চা এগিয়ে দিল মানবেন্দ্রর দিকে। কী সুন্দর পেলব তার আঙুলগুলো। সেই আঙুলে চামচে ধরে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে ক'চামচ চিনি?

সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, পাঁচ চামচ।

কোনও আধুনিক মানুষই চায়ে এক চামচ-দেড় চামচের বেশি চিনি নেয় না। সকলেই স্বাস্থ্যবিধি মানে। অনুরাধা তার নদীর মতো ভুরুদুটি তুলে বলল, পাঁচ?

মানবেন্দ্র আবার বললেন, হ্যাঁ। অনেকেই নিশ্চয়ই আপনাকে বলে যে, আপনার হাতের ছোঁয়াতেই চা মিষ্টি হয়ে যায়? আমি একটা উলটো কথা বললাম।

অন্যরা হাসল। এটা মোটেই উচ্চাঙ্গের রসিকতা নয়। বরং একটু অসমীচীন। কিন্তু মানবেন্দ্র প্রথম থেকেই অনুরাধাকে অপছন্দ করে ফেলেছেন। কারণ তিনি বোধহয় আগেই বুঝে ফেলেছেন যে, অনুরাধাও তাকে পছন্দ করবে না। কী করে এটা বুঝলেন? এক ধরনের পাগলামির যুক্তিবোধ। তিনি সত্যিই সেই অত্যন্ত মিষ্টি বিস্বাদ চা খেতে লাগলেন।

হিরন্ময় বলল, আপনি মানসীর গান শুনবেন? ও খুব ভাল গান করে। ইচ্ছে করলেই রেডিয়োতে গাইতে পারে। কিন্তু ও নিজেই কিছুতেই রাজি হয় না।

মানবেন্দ্র ওই ভিলেজ ইডিয়টির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনও জানা হল না।

অসীম বলল, হিরন্ময় আমাদের বন্ধু, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড লয়েডসে আছে, এখন ব্যাচিলার।

এই সব আলোচনার থেকে গান ভাল। মানবেন্দ্র মানসীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনি একটা গান করুন।

গৌতম সমর্থন করল তাকে। এবং আরও বলল, মানসীর একটা গুণ আছে, ওকে বেশি অনুরোধ করতে হয় না। কখনও বলে না, সঙ্গে বই নেই কিংবা গলা খারাপ।

মানসী তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, থাক হয়েছে! কী গান গাইব?

গৌতম বলল, যেটা খুশি।

মানসী এবার মানবেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার সামনে গান গাইতে কিন্তু আমার লজ্জা করছে।

এই প্রথম তার মানবেন্দ্রর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা। মেয়েটি খুব স্বাভাবিক গলায় স্পষ্টভাবে কথা বলে। কিন্তু একটু কম কথা বলে মনে হয়।

মানবেন্দ্র বুঝতে পারলেন, তিনি এদের মাঝখানে লেখক সেজে একটু ভারিক্কিভাবে বসে আছেন। এঁরা তাকে বিশেষ অতিথির সম্মান দিচ্ছে। তিনি এই সম্মানের যোগ্য নন। এরা তো জানে না, তিনি কত জায়গায় কত রকম অপমান সহ্য করেন, এখনও।

অনেকের কাছেই এক জন সাহিত্যিকের কোনও দাম নেই। যারা সুখী সুখী জীবন কাটায়, বেশি বই-টই পড়ে না, তাদের কাছে এক জন লেখক মানে এমন আর কী! তারা অনেক গল্প-উপন্যাস পড়ে লেখকের নামটাও মনে রাখে না। মানসী যে বলল, আপনার সামনে–তার মানে ঠিক কী? মানসী তাকে চেনে?

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

মানসী বলল, আমি তো ঠিক গান শিখিনি। এমনিই ইচ্ছে হলে...আপনার ভাল লাগবে কি না।

মানবেন্দ্র বললেন, একটু আগে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আপনার গান শুনছিলাম। আর একটা গান করুন।

মানসী ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করল। গুন গুন করল একটা সুর। তারপর ধরল –

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না। ...

গানটি শেষ করতে সময় লাগল মিনিট পাঁচেক। মানবেন্দ্র একেবারে গুম হয়ে বসে রইলেন। গানটা তাকে অসম্ভব স্পর্শ করেছে। যেন এটা তার নিজেরই কথা। এক জন পাগলের কথা। কেউ বোঝে না তারে, সে যে বোঝে না আপনারে-এ-রকমভাবে আগে ভেবে দেখেননি। আগাগোড়া এত সরল ভাষা, কিন্তু একটা তুলনাহীন লিরিক। তারে মানা করে কে–এখানে মানা শব্দটা কী চমৎকার নতুন বিশ্বাসই করা যায় না, 'উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া' যাঁর লেখা, তিনিই এটা লিখেছেন।

গান শেষ হবার পরও মানবেন্দ্র একটুক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। তারপর সচকিত হয়ে উঠলেন। একটা কিছু বলা দরকার। গান নয়, গানের কথাগুলোই তাকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছে।

তিনি মুখ তুলে মানসীকে বললেন, গানটা নতুন ভাবে শুনলাম।

এ-সব গান কি কখনও পুরনো হয়? এই ধরনের আজেবাজে কথা বলতে শুরু করল হিরন্ময়। মানবেন্দ্র সে- দিকে মনোযোগ দিলেন না। তিনি দেখলে লাগলেন মানসীকে।

মানসী সোজা চেয়ে আছে মানবেন্দ্রর দিকে। কী অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। যেন সে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু মানবেন্দ্র সব সময় চোখের ভাষা পড়তে পারেন না। তিনি বোঝেন স্পর্শের ভাষা। তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন, আবার তাকালেন। তখনও মানসী চেয়ে আছে, কিছু বলতে চাইছে। মানবেন্দ্রর ভেতরের পাগলামিটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তার দুর্দান্ত ইচ্ছে জাগল হাতখানা বাড়িয়ে মানসীর থুতনিটা একটু ছুঁয়ে দেবার। তিনি নিজেকে দমন করতে পারছেন না। হাতটা নিশপিশ করছে। ওকে একবার ছুঁতেই হবে। আর কিছু না, শুধু একটা ছোঁয়া। যেন ওকে একবার ছুঁয়ে দিলেই বোঝা যাবে, ও কী বলতে চাইছে। মানসী বেশ খানিকটা দূরে বসে আছে। অত দূর হাত পৌঁছবে না।

মানবেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

গৌতম জিজ্ঞেস করল, এ কী, আপনি যাচ্ছেন!

মানবেন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মানসীর দিকে।

মানসী বলল, বসুন!

যেন একটা হুকুম। মানসীর ওই কথাতেই মানবেন্দ্রর ঘোর কেটে গেল। তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন। এত লোকজনের সামনে- মানসী কি বুঝতে পেরেছে তার উদ্দেশ্য? নইলে

কেন শুধু বলল, বসুন। ঠিক হুকুমের সুর। যেন সিংহকে পোষ মানাবার অভ্যেস আছে ওর! স্বাভাবিক ভাবে কি ওর বলা উচিত ছিল না, আপনি আর একটু বসুন!

মানবেন্দ্র গৌতমের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একটা চুরুট আনতে যাচ্ছিলাম। ঘরে ফেলে এসেছি।

অসীম তক্ষুনি তার সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সিগারেট নিন না! আপনার সিগারেট চলে না?

মানবেন্দ্র সিগারেট নিয়ে ধরালেন। প্রথম ধোঁয়া টেনেই ভারি ভাল লাগল। প্রায় চার-পাঁচ মাস বাদে তিনি আবার সিগারেট টানছেন। যেন হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকাকে নতুন চুম্বন।

কিন্তু মানবেন্দ্র লক্ষ্য করলেন, তার হাত কাঁপছে। বেশ চোখে পড়ার মতো কাঁপুনি। এ-রকম তো আগে কখনও হয়নি। অন্যরা যাতে কিছু বুঝতে না পারে সেই জন্য তিনি হাতটা রাখলেন উরুর ওপরে। তার পর টের পেলেন, তার বুকের মধ্যেও দুপ দুপ শব্দ হচ্ছে বেশ জোরে। এই শব্দ অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

গৌতম জিজ্ঞেস করল, আপনি যে এখানে একটা ঝরনার কথা বলছিলেন।

প্রশ্নটা শুনে মানবেন্দ্র এমন ভাবে তাকালেন যেন একটা নতুন কথা শুনলেন। ঝরনা? এখানে আবার ঝরনা কোথায়?

গৌতম আবার বলল, আপনিই তো একটা ঝরনার কথা বলেছিলেন।

ততক্ষণে মানবেন্দ্র খানিকটা কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, সেটা দেখে যাবেন, যদি পারেন। এমন কিছু নয়, কিন্তু জায়গাটা খুব নির্জন, খানিকটা জঙ্গল মতো।

কত দূরে?

মাইল তিনেক।

ঝরনাটার কথা তো এখানে আর কেউ বলেনি।

আমি হাঁটতে হাঁটতে এক দিন গিয়েছিলাম। হাঁটা-পথ ছাড়া আর কোনও পথও নেই অবশ্য।

আমরা তো পরশু সকালেই চলে যাব ঠিক করেছি, তাহলে কালই দেখে ফেলতে হয়।

সব মিলিয়ে ঘণ্টা দু-এক লাগবে।

হিরন্ময় মাঝখান থেকে বলল, আপনি কি এখানে কিছু লেখবার জন্য এসেছেন?

মানবেন্দ্র সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দিলেন, না।

আপনি এখানে নতুন কী লিখছেন?

কিছুনা।

হিরন্ময় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, গৌতম তাকে বাধা দিয়ে মানবেন্দ্রকে বলল, আপনি বোধহয় নিজের লেখা সম্পর্কে কোনও রকম আলোচনা করতে চান না, তাই না? অনেক সহিত্যিক চায় না, আমি জানি।

এই কথারও উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই, এইভাবে মানবেন্দ্র ঈষৎ স্মিত মুখে চুপ করে বসে রইলেন।

অনুরাধা বলল, রাইটাররা কী করে এত সব বানান বুঝতে পারি না। আচ্ছা, সবই কি বানানো না কিছুটা সত্যি থাকে?

মানবেন্দ্র মুখের হাসিটা একটু চওড়া করে বললেন, সবই সত্যি। একটুও বানানো নয়।

আপনারা যা লেখেন সবই সত্যি?

হ্যাঁ।

অনুরাধার মুখখানি এই কথার পর একটু ম্লান হয়ে গেল। যেন সে বুঝতে পেরেছে মানবেন্দ্র তার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। তার কথার কোনওই গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

মানবেন্দ্র সেটা লক্ষ্য করে এবার একটু বেশি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আপনি বিশ্বাস করলেন না? পৃথিবীতে যা আছে, তা ছাড়া মানুষ আর কিছুই কল্পনা করতে পারে না। এমন কী মানুষ যে মিথ্যে কথা বলে, কোথাও না কোথাও সেগুলোও সত্যি।

অনুরাধা বলল, আপনি আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে পারেন?

মানবেন্দ্র বললেন, যদি আর্টিস্ট হতাম, অর্থাৎ পেইন্টার, তা হলে এক্ষুনি বলতাম, পারি। লেখকদের পক্ষে চট করে বলা শক্ত।

কেন?

এক জন ডাক্তার অপারেশান টেবিলে তার পেসেন্টকে যেমন ভাবে জানে, এক জন লেখককে তার চেয়েও বেশি জানতে হয় তার পাত্র-পাত্রীদের।

বাবাঃ, আপনি এমন ভাবে বললেন, যেন আমি ভাবলাম, আমি সত্যিই একটা অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছি। ভাবলেই ভয় করে!

মানবেন্দ্র সিগারেটে আর একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন, তাছাড়া, জানেন তো, অবৈধ প্রেম ছাড়া গল্প হয় না! বেশ সুখী বিবাহিত জীবন নিয়ে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সার্থক কিছু লেখা হয়নি।

অনুরাধা একবার চট করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে মুচকি হেসে বলল, কী করে জানলেন, আমার সেরকম কিছু প্রেম-টেম নেই? বিয়ে করলেই কি সব শেষ হয়ে যায়।

সিনেমার নায়িকা হিসেবে কিন্তু আপনাকে খুব ভাল মানাত!

তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে হিরন্ময় বলল, অনুরাধাকে তো সত্যজিৎবাবু একবার পছন্দ করেছিলেন ওঁর একটা ছবির জন্য। কিন্তু অনুরাধার মা-বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না।

হিরন্ময়কে তার বন্ধুপত্নীদের জন্য বেশ গর্বিত দেখা যায়। এক জন ইচ্ছে করলেই রেডিয়োতে গান গাইতে পারত, গায় না। এক জন সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সুযোগ পেয়েও নেয়নি। এই রকম গুণান্বিতা তৃতীয় কোনও মেয়ে পাচ্ছে না বলেই বোধহয় সে নিজে বিয়ে করতে পারছে না।

মানবেন্দ্র তাকালেন মানসীর দিকে। যদিও সে প্রায় কোনও কথাই বলছে না। অথচ তার দৃষ্টিতে মনে হয়, সেই সব চেয়ে বেশি কথা বলছে। মানবেন্দ্র চোখের ভাষা বোঝেন না।

বাচ্চারা খেলা করছে অদূরের বারান্দায়। মাঝে মাঝে তাদের চ্যাঁচামেচি ও ঝগড়ার আওয়াজ শোনা যায়। এই দুই রমণীর মধ্যে কার দুটি বাচ্চা, কার একটি? এদের দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না এরা জননী। শুধু নারী হয়ে বসে আছে এখন।

গৌতম মানসীকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আর একটা গান গাইবে?

মানসী বলল, না, আজ থাক।

অনুরাধা বলল, আর একটা গান কর না, ও তোর গান শুনতে এত ভালোবাসে।

মানবেন্দ্র একটু চমকে তাকালেন।

মানসী বলল, আমি তো সব সময়েই গান করছি।

অনুরাধা মানবেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একদম গান জানি না।

অসীম বলল, কিন্তু অনুরাধা, তোমারও সেতারে ভাল হাত ছিল, চর্চাই করলে না।

হিরন্ময় সেই সঙ্গে যোগ করল, নিখিল ব্যানার্জির ছাত্রী ছিল।

মানবেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এখন তিনি এখান থেকে উঠে পড়লে কিছুই অভদ্রতা হবে না। কিন্তু কেউ যেন তাকে পেরেক দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। তিনি বার বার তাকাতে লাগলেন গৌতমের দিকে। এত সুন্দর যুবাপুরুষটি যে-কোনও কারণেই হোক তার স্ত্রীকে খুব ভয় পায়। সে আড়ষ্ট হয়ে আছে। অসীমের ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক।

আড্ডা ভাঙল রাত নটায়। মানসীই প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই, বোধহয় বাচ্চাদের খিদে পেয়েছে।

মানসী আর একবার তাকাল মানবেন্দ্রর দিকে। কোনও বিদায়-বাক্য উচ্চারণ করল না।

একটু বাদেই সবাই উঠল। মানবেন্দ্র তার পরেও অনেকক্ষণ বসে রইলেন সেখানে। অন্যরা খাবার ঘরে গেল, বেয়ারা ডাকতে এল তাকে খেয়ে যাবার জন্য। তিনি ফিরিয়ে দিলেন। চুপ করে বসে থেকে তিনি যেন কোনও কিছুর প্রতীক্ষা করছেন। তারপর, সকলেই যখন যে-যার ঘরে চলে গেল খাওয়া দাওয়া সেরে, তখন মানবেন্দ্র চলে এলেন নিজের ঘরে। বেয়ারাকে ডেকে বললেন ঘরেই খাবার দিতে। তারপর বই খুলে গভীর মনোযোগে ডুব দিলেন।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মানবেন্দ্র বইটা মুড়ে রেখে এসে দাঁড়ালেন ঘরের দরজার কাছে। এর মধ্যেই অন্য সব ঘরে আলো নিভে গেছে, টুরিস্ট লজটা একেবারে নিস্তব্ধ।

বাগানে চেয়ারগুলো এখনও ঠিক সেইভাবে পাতা রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্রর একবার সামান্য দৃষ্টিবিভ্রম হল। তিনি দেখলেন, চেয়ারগুলো যেন ভর্তি, যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই বসে আছে। এমনকী নিজেকেও দেখতে পেলেন সেখানে।

আকাশে ফট ফট করছে জ্যোৎস্না। কী নিথর, সুন্দর এই রাত্রি। এখানকার রাত্রির আকাশে সব তারাই খুব স্পষ্ট। মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন কালপুরুষকে, কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁটে যেন পাহারা দিচ্ছেন এই গ্রহটিকে।

সে-দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র অস্ফুট ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমার আয়ু আর কত দিন?

কালপুরুষ বললেন, আরও অনেক দিন। এখনও তো জীবনের অর্ধেকও কাটেনি।

মানবেন্দ্র বললেন, কেন? একথা বলার পর আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে মানবেন্দ্র নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি বেশি দিন বাঁচতে চাই না? নিশ্চিয়ই চাই। সব মানুষই চায়। তবু কেন যেন মনে হচ্ছে আর বেশি দিন আয়ু নেই। পাগল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

পায়ের শব্দ না করে মানবেন্দ্র হেঁটে এলেন বাগানে। যে-চেয়ারটাতে তিনি বসেছিলেন, সেই চেয়ারটাতেই বসলেন। তারপর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মানসী আসবে।

মানসী শুয়ে আছে নিজের বিছানায়। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বামীকে ঘুম পাড়াতে তার কতটা সময় লাগবে, কে জানে! যত সময়ই লাগুক, মানবেন্দ্র অপেক্ষা করবেন। মানসীর নিশ্চয়ই এক সময় মনে পড়ে যাবে, মানবেন্দ্রকে সে কোনও কথাই বলেনি। এমনকী, বিদায় নিয়েও যায়নি। মানসী একবার শুধু তাকে হুকুম করেছিল, বসুন। তারপরে তো আর বলেনি, আমি যাচ্ছি, আর আপনার বসে না থাকলেও চলবে!

বিরাট লম্বা লম্বা এক একটা মিনিট কাটতে লাগল। মানবেন্দ্র পায়ের ওপর পা তুলে চুপ করে বসে আছেন। শীত পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। খোলা মাঠে হিম পড়ছে মাথায়। মানবেন্দ্রর ভ্রূক্ষেপ নেই।

কতক্ষণ কাটল কে জানে। শীতে হাত-পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে। তাছাড়া আছে মশা। মানসী আসবে। মানসীর কিছু বলার আছে। তাছাড়া মানসীকে জিজ্ঞেস করতেই হবে, ওকে দেখে

কেন আমার বুক কাপল, এখনও কাঁপছে। এটা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অনেক দিন তো এরকম হয়নি।

এক সময় মানবেন্দ্রকে উঠে পড়তেই হল। তবু তিনি খুব সতর্ক ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন বারান্দায়। হয়তো মনের ভুলে মানসী ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু রাত্তিরে কি তার একবারও ঘুম ভাঙবে না? অনেকের তো ভাঙে। ঘুম ভাঙলেই মানসীর মনে পড়ে যাবে, মানবেন্দ্রকে সে হুকুমের সুরে বলেছিল, বসুন! একথা বলার পর তো কেউ বিদায় না নিয়ে যায় না। মানসী নিশ্চয়ই বাইরে এসে দেখবে, লোকটা এখনও বসে আছে কিনা। যদি মানসী একবার দরজা খুলে বাইরে বেরোয়, মানবেন্দ্র তার সামনে গিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলবেন, চুপ!

কোনও ঘরের দরজা খুলল না। মানবেন্দ্র দেখে রেখেছেন, কোনটা মানসীর ঘর। একসময় তিনি নিঃশব্দে সেই ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। চোরের মতো দরজায় কান লাগিয়ে শুনবার চেষ্টা করলেন, ভেতরে নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায় কিনা! মানসী কী ভঙ্গিতে শুয়ে আছে? পাশ ফিরে? সে কি রাত্রে শাড়ি ছেড়ে পোশাক পরে?

ডাইনিং হলের দিকে কীসের যেন একটা শব্দ হল। মানবেন্দ্র দারুণ চমকে উঠলেন। এখানকার বেয়ারারা কেউ জেগে উঠতে পারে, এ-দিকে আসতে পারে। গেটে দারোয়ান আছে। এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

মানবেন্দ্র ফিরে এলেন নিজের ঘরে। দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে মানবেন্দ্রর খেয়াল হল, মানসী যদি আসে, যদি দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়? তা তো হতেই পারে না। তিনি দরজাটা আধখানা ভেজিয়ে রাখলেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে বাগানের দিকে জানলাটার কাছে বসে রইলেন। এখান থেকে চেয়ারগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানসী যেই এসে চেয়ারে বসবে, অমনি তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে সেখানে যাবেন। কিংবা ওখানে মানসী তাকে দেখতে না পেলে আসবে এই ঘরের দিকে।

ধ্যানে ঈশ্বরকে ডাকার মতো মানবেন্দ্র চোখ বুজে তীব্র ইচ্ছার তরঙ্গ পাঠিয়ে দিয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, মানসী, তোমার ঘুম ভেঙে যাক। মানসী, তুমি জেগে ওঠো, তুমি আমার কাছে চলে এস!

মানবেন্দ্র যখন শেষ আশা ছাড়লেন, তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। তার মুখখানা দারুণ বিমর্ষ হয়ে গেল। এ কী এক অসম্ভব চিন্তায় তিনি নিজেকে এতক্ষণ কষ্ট দিচ্ছিলেন। মানসীর সঙ্গে তাঁর আজই আলাপ হয়েছে, কথা হয়েছে মাত্র দুতিনটে, সাধারণ কথা। সেই মেয়েটি কেন রাত্রে তার স্বামীর পাশ থেকে উঠে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে? এ কখনও হয়? ভুল ধারণা! শীতের মধ্যে এতটা রাত জেগে যে তিনি বসে রইলেন, এটা কি নিছক পাগলামি নয়? নিজের কাছে তিনি আবার হেরে যাচ্ছেন।

মানবেন্দ্র একটা কাচের গেলাস তুলে ছুঁড়ে মারলেন মেঝেতে। ঝন ঝন শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেক বেশি তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তবু সেই শব্দেও কারুর ঘুম ভাঙল না।

কিন্তু মানবেন্দ্র ধাতস্থ হলেন।

মাথা ঠাণ্ডা করে তিনি ভাবলেন, একটা কাচের গেলাস ভাঙা কিছুই নয়। মানুষ শখ করেও ভাঙতে পারে। আমি এ-রকম আগেও ভেঙেছি। শব্দটা আমার ভাল লাগে। একে পাগলামি বলে না।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে তিনি ঘুমের ওষুধের শিশিটা বার করলেন। এর গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশেক খেলেই সব ঠিক হয়ে যায়। তার কাছে বিরানব্বইটা আছে। ইচ্ছে করেই এতগুলো এই ওষুধ কাছে রেখেছেন। এর থেকে একটা দুটোর বেশি কখনও যে খেতে ইচ্ছে করে না, এটাই তো তার স্বাভাবিকতা। বেঁচে থাকার ইচ্ছের মতো স্বাভাবিক আর কী!

দুটো ট্যাবলেট খেয়ে মানবেন্দ্র আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

.

০৪.

পরদিন ঘুম ভাঙার পরই মানবেন্দ্র ঠিক করেছিলেন, ওই দলটা টুরিস্ট লজ ছেড়ে যাবার আগে তিনি আর ঘর থেকেই বেরুবেন না। একদিন দেড় দিন ঘরের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই না। ওদের সঙ্গে আর দেখা করতে চান না তিনি। জীবনে আর জটিলতা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওরা যদি তাঁর কাছে বিদায় নিতে আসে, তিনি এখান থেকে শুকনো ভদ্রতা সেরে দেবেন।

ঘরে বসেই ব্রেকফার্স্ট খেয়ে তিনি আবার বই খুলে বসলেন। টিকটিকিগুলো কিংবা মথটার কথা তিনি ভুলেই গেছেন।

একটু পরে একটা শব্দে তিনি বই থেকে চোখ তুলে তাকালেন। একটি বাচ্চা মেয়ে তার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানবেন্দ্র মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। মেয়েটিও কিছু বলল না। বাচ্চারা এই রকম হয়, অনেক সময় মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, কোনও কথা বলে না। মানবেন্দ্রও ছোটদের সঙ্গে একেবারেই ভাব জমাতে পারেন না।

মেয়েটি মিনিট দুএক ও-রকম ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর জিজ্ঞেস করল, তুমি বুঝি এ ঘরে থাক?

হ্যাঁ।

এটা তোমার বাড়ি?

না, এটা তো গভর্নমেন্টের বাড়ি।

মেয়েটি ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল কয়েক পা। বছর পাঁচেক বয়েস। বেশ ফর্সা রঙ, সম্ভবত গৌতম-অনুরাধারই মেয়ে হবে। টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, তোমার ওই বইটাতে ছবি আছে?

না তো।

তোমার কাছে কোনও ছবির বই নেই?

উঁহু।

আমার অনেক ছবির বই আছে, কিন্তু সেগুলো আনিনি। কলকাতায় ফেলে এসেছি। তুমি ছবি আঁকতে পারো না?

হ্যাঁ। আমি অনেক ছবি এঁকেছি।

আমার কাছে সাদা কাগজ আছে, কলম আছে, তুমি ছবি আঁকবে?

তোমার লাল-নীল পেনসিল নেই?

বাইরে থেকে কার গলা শোনা গেল, রিনি! রিনি!

বাচ্চা মেয়েটি হেসে বলল, আমার নাম রিনি।

মানবেন্দ্র এবার হেসে বললেন, ও তাই বুঝি! আমার নাম মানবেন্দ্র। নমস্কার রিনি দেবী।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মানসী। জিজ্ঞেস করল, আপনাকে বিরক্ত করছে বুঝি?

না, না।

রিনি, কেন এখানে এসেছ?

রিনি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি কিন্তু কোনও জিনিসে হাত দিইনি। তারপর সে এক ছুটে মায়ের পাশ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

মানসী একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দরজার কাছে। রহস্যময় গভীর দৃষ্টি। মানবেন্দ্রর মনে হল, মানসীর দৃষ্টির রঙ গাঢ় নীল।

তিনি মানসীকে ঘরের ভেতরে এসে বসার জন্য অনুরোধ করলেন না। তিনিও মানসীর চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

মানসী নিজে থেকেই ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে এসে বলল, বাঃ, কী সুন্দর প্রজাপতিটা!

মথটা তখনও দেয়ালে তার রূপ মেলে দিয়ে বসে আছে। ও এখনও বেঁচে আছে, এটা সত্যিই একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

মানসী বলল, এত বড় প্রজাপতি আগে কখনও দেখিনি।

প্রজাপতি নয়, মথ। একরঙা, ডানাগুলো একটু মোটা।

ও হ্যাঁ। ওগুলো তো রাত্তিরে আসে।

ও নিজে নিজেই আমার ঘরে এসেছে পরশু রাত্তিরবেলা।

মানসী আরও এগিয়ে দেয়ালের কাছে এসে মথটাকে দেখতে লাগল। কোনও রকম আড়ষ্টতা নেই তার মধ্যে। সে নিজে থেকেই কথা বলছে।

মানবেন্দ্রর মনে মনে হাসি পেল। কাল প্রায় সারা রাত তিনি মানসীর জন্য অপেক্ষা করে জেগে বসে ছিলেন। মানসী সেকথা কোনও দিন জানতে পারবে না। ওকে বললেও বিশ্বাস করবে না। আজ সকালে মানসী নিজের থেকেই এসেছে। এখন দিনের আলো, এখন সব কিছু অন্য রকম। মানসী তো মথ নয়, প্রজাপতি, তাই ও রাত্রে আসেনি।

মুখ ফিরিয়ে আচম্বিতে মানসী বলল, আমি আপনাকে অন্য রকম ভেবেছিলাম।

তার মানে?

যে-মানবেন্দ্র মজুমদারকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি, তাকে আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম।

আমাকে আপনি...চেনেন?

চিনি না? বাঃ।

ও। অন্য রকম মানে কী-রকম ভেবেছিলেন? গল্পের নায়কের চেহারা আর লেখকের চেহারা কখনও এক রকম হয় না।

আমি চেহারার কথা বলছি না। চেহারায় কী আসে যায়। পুরুষরা যত চেহারা নিয়ে মাথা ঘামায়, মেয়েরা কিন্তু ততটা নয়।

আমার অভিজ্ঞতা অন্য রকম।

আপনার কি সবকিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে?

না, তা নেই। সে-রকম দাবি করতে পারি না।

আপনি যে এত গম্ভীর তা ভাবিনি।

আমি গম্ভীর? না তো! এক এক সময় আমি খুবই বক বক করি। তবে সব সময় কথা বলতে ভালো লাগে না, তা-ও ঠিক। কিন্তু আপনিই তো কাল প্রায় সব সময় চুপ করে ছিলেন।

আমি তো গান গাইলাম।

গান তো কথা নয়।

আপনার ওপর আমার খুব রাগ আছে। কখনও দেখা হলে বলব ভেবেছিলাম।

আমি তাহলে ঠিকই বুঝেছিলাম, আপনি আমাকে কিছু বলতে চান। বিশ্বাস করুন, কাল সন্ধেবেলাই আপনার চোখ দেখে মনে হয়েছিল আমাকে কিছু বলবেন। আলাদা ভাবে। তাহলে আমি ভুল করিনি।

আপনি অতীনকে মেরে ফেললেন কেন?

মানবেন্দ্রর চোখে-মুখে একটা উৎসাহের দীপ্তি এসেছিল, হঠাৎ আবার সেটা নিভে গেল। তিনি নিরাশভাবে বললেন, ও, এই কথা!

হঠাৎ ওকে মেরে ফেলেই বইটা শেষ করে দিলেন।

গল্পের নায়করা তো কোনও এক সময় মরবেই।

ও কি শুধু গল্পের নায়ক? আমাদের কাছে সত্যি হয়ে উঠেছিল, ও তো অনেক আগেই মরতে পারত, বিপ্লবের সময় কিংবা জেলখানায়। শেষ পর্যন্ত ওকে দীপ্তিদির কাছে ফিরিয়ে এনে তারপর হঠাৎ।

আপনি একটু বসবেন?

আমরা সবাই এক্ষুনি বেরুচ্ছি।

তবু দুএক মিনিট।

না, ওরা আমাকে খোঁজাখুঁজি করবে।

মানবেন্দ্র দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মানসীর একটা হাত ধরে কাতর ভাবে বললেন, তুমি একটু বসো!

মানসী একটুও চমকাল না। মানবেন্দ্রর হাতের দিকে একবার তাকাল, তারপর নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বসে পড়ে বলল, আপনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেও আমার ভাল লাগবে। কিন্তু আপনার তো অত সময় নেই।

আমার অফুরন্ত সময়।

কিন্তু আমি যে আগে সকলের মুখে শুনেছি, আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ।

তার মানে, আমার কথা কে বলেছে তোমাকে?

মানসীকে আপনি থেকে হঠাৎ তুমি সম্বোধন করার জন্য মানবেন্দ্র কোনও কৈফিয়ত দিলেন না। এইটাই যেন খুব স্বাভাবিক। যদিও মানবেন্দ্র অচেনা নারীদের কক্ষনও তুমি সম্বোধন করেন না।

আপনাকে অনেকে চেনে। তার মধ্যে দুএক জনকে আমি চিনি। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করার। অনেক দিন থেকে।

মানবেন্দ্র দুঃখিত ভাবে বললেন, কেন দেখা করোনি?

ইচ্ছে থাকলেই কি সব কিছু করা যায়। তাছাড়া, আপনার মতো ব্যস্ত লোকের সঙ্গে দেখা করা, যদি বলতেন...।

সেই সব ব্যস্ততা এখন ফুরিয়ে গেছে।

আমিও দেরি করে ফেলেছি।

মানসী এই কথাটা বলল মুখ নিচু করে, খুব আস্তে। মানবেন্দ্র ভাল করে শুনতে পেলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, কী?

মানসী বলল, না, কিছু না।

মানসী আবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অন্য কারুর সঙ্গে আলাপ করতে অনেক দেরি লাগে। কিন্তু আপনাকে আমি মনে মনে অনেক দিন থেকেই চিনি।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমিও তোমাকে অনেক দিন থেকে চিনি।

না, সেটা ঠিক নয়।

মানসী এগিয়ে গেল দরজার কাছে, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি কাল অনুরাধাকে ও-রকম মনে আঘাত দিয়ে কথা না বললেই পারতেন।

মনে আঘাত দিয়েছি?

হ্যাঁ দিয়েছেন। ও যখন বলল ওকে নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা...।

কারুকে একবার দেখলেই কি গল্প লেখা যায়।

আপনার সব নায়িকাই তো ওই রকম সুন্দর হয়।

আমার মনে হয়, তুমি- ।

অনুরাধা সত্যিই চায়, ওকে নিয়ে কেউ...।

আমার মনে হয়, তুমি...।

আপনি আমাকে তুমির বদলে আপনি বললেই ভাল করতেন। সেটাই ভাল দেখায়।

আমি কাল সন্ধে থেকেই মনে মনে তোমাকে তুমি বলে ফেলেছি, সেটা এখন আর ফেরানো যায় না।

মানসী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে একটু হাসল। সেই হাসিতে ভরে গেল সম্পূর্ণ ঘরটা। হাসির সময় মানসীর মুখটা সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখায়। মনে হয়, এ পৃথিবীর মানুষই নয়। অন্য কোনও গ্রহ থেকে কিছু দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে।

মানসী বলল, সব লেখকই বুঝি এ-রকম পাগল হয়?

মানবেন্দ্র বলতে গেলেন, অন্যদের কথা জানি না। কিন্তু তিনি আর মানসীকে দেখতে পেলেন না। হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে যাবার মতো মানসী চকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মানবেন্দ্রই উঠে এলেন দরজার কাছে। কিন্তু সংকল্পটা রক্ষা করলেন, ঘর থেকে বেরুলেন না।

মানবেন্দ্র ডান হাতখানা মেলে সে-দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই হাত দিয়ে তিনি মানসীর হাত ছুঁয়েছিলেন। কোনও রকম আপত্তি তো ও করেনি। একটুখানি ছুঁয়েই অনেক কিছু পাওয়া যায়।

ঘরে যেন একটা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। হয়তো মানসী কোনও দুর্লভ পারফিউম মেখে এসেছিল। কিন্তু সে যতক্ষণ ঘরে ছিল, ততক্ষণ তো এই গন্ধটা পাওয়া যায়নি।

তিনি চলে এলেন মাঠের দিকের জানলার কাছে। অনেকখানি বিস্তৃত প্রান্তর ও তার মাথার ওপর সমান্তরাল আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মনটাও একটু বড় হয়ে যায় মনে হয়। আজ বেশ জোরে হাওয়া বইছে। একজন লোক একা একা হেঁটে যাচ্ছে মাঠের মধ্য দিয়ে। কাঁধে একটা ঝোলা। লোকটি যেন দিগন্তেরও ও-পার পর্যন্ত হেঁটে যাবে। এই সব লোক দেখলেই পথিক কথাটা মনে পড়ে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন, গৌতমদের গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। সামনের সিটে পুরুষ তিন জন, পেছনে মেয়েরা ও বাচ্চারা। মোটর গাড়ির যাত্রী ও যাত্রিণীদের জন্য পথিক-এর মতো এমন সুন্দর কোনও শব্দ এখনও তৈরি হয়নি।

সেদিক থেকে চোখে ফেরাতেই তিনি দেখতে পেলেন জানলার ঠিক নিচের চন্দ্রমল্লিকা ফুলটিকে। ফুলটা আজ বেশ যুবতী হয়েছে। হাওয়ায় দোলাচ্ছে মাথা।

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

ফুলটি মাথা দোলাতে দোলাতে উত্তর দিল, আমি সব দেখছি! আমি সব দেখছি।

ও, তুমি সব দেখছ? আমার এই শুকনো ঘরে আজ একটি মেয়ে এসেছিল, তুমি দেখেছ?

তিনি ফুলটির ওপর আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে আবার বললেন, আচ্ছা বলো তো ফুলকুমারী, ফুলেরও কি হিংসে থাকে? তুমি না বলছ? আমি বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ থাকে, আমি জানি।

ফুলটার ওপর হাত রেখে আঙুলে একটা সুন্দর অনুভূতি হল। মানবেন্দ্র ভাবলেন, নারীর থেকে ফুলও কম সুন্দর নয়।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে তিনি তিলককামোদের একটা সুর ধরলেন। মাথার ওপর হাত তুলে ব্যায়ামের ভঙ্গি করলেন খানিকক্ষণ। তারপর বেয়ারাকে ডেকে সিগারেট আনতে দিলেন এক প্যাকেট। মনটা খুব খুশি লাগছে। আজ চুরুটের বদলে সিগারেটই খেতে হবে।

মনটা খুশি খুশি লাগছে কেন? একটি মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছেন, সেই জন্য? নারী-সঙ্গ পাওয়ার জন্য তার মনটা সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু নিজেকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার জন্য, কষ্ট দেবার জন্যই তো তিনি এখানে এসেছেন?

তাছাড়া যে-কোনও নারীই এখন তাকে আর আকর্ষণ করে না। এক সময় ছিল, যখন অন্ধের মতো নারীদের শরীরে এমন কিছু খুঁজে বেড়াতেন যা কখনও পাওয়া যায় না। এখন সেই ভুল ভেঙেছে। এক সময় তার রূপের প্রতি মোহও ছিল সাঙ্ঘাতিক। চোখ ঠিকরোনো রূপসী নারীদের দেখলেই পতঙ্গের মতো তাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করতেন। প্রেমে ব্যর্থ হতে ভারি ভাল লাগত।

এখন সেই মোহ ঘুচেছে। এখন বুঝতে পারেন, সকলেই যাদের রূপসী বলে, তারা আসলে সুন্দর নয়। রূপকে আবিষ্কার করতে হয়। সৌন্দর্য হচ্ছে একটা অভিজ্ঞতা। অন্য সবকিছুর থেকে আলাদা হওয়াই সৌন্দর্যের একটা বড় শর্ত। ফুল প্রকৃতপক্ষে সুন্দর নয়, কারণ, এক জাতের ফুল সব এক রকম। ফুল সেই রকমই সুন্দর যেমন বাঘ সুন্দর, জেপ প্লেন সুন্দর, গোরুর চোখ সুন্দর, বৃষ্টির পর আকাশ সুন্দর, কিংবা একটা স্বাস্থ্যবান আপেল কিংবা কোকিলের স্বর। নারীর সঙ্গে এসব কিছুরই তুলনাই হয় না। অনুরাধাকে সকলেই সুন্দরী বলবে, কিন্তু মানবেন্দ্র প্রথমেই মুগ্ধ হয়েছিলেন মানসীকে দেখে। মানসীকে দেখে চেনা মনে হয়েছিল। অন্য কারুর মতো দেখতে নয়, মানবেন্দ্রও আগে কখনও ওকে দেখেননি, তবু চেনা। এই অনুভূতির ব্যাখ্যা তিনি করবেন কী করে?

এ বিষয়ে মানবেন্দ্রর কোনও সন্দেহও রইল না যে, মানসী তার জন্যই ঠিক এই সময়ে এসেছে এই বাংলোতে বেড়াতে। পৃথিবীতে কোথাও একটা কার্যকারণের হেড অফিস আছে, সেখান থেকে অনেক বাছাবাছি করে শুধু মানসীকেই পাঠানো হয়েছে প্রায়-উন্মাদ লেখকের শুশ্রূষার জন্য।

এ-রকম হয়। অনেক দিন আগে একবার মানবেন্দ্র বদ্ধমাতাল হয়ে মাঝরাত্রির পর ট্যাক্সিতে চেপেছিলেন। এমন বেঘোর অবস্থা যে, চিনতে পারছিলেন না রাস্তা। ট্যাক্সিওয়ালা বহু রাস্তা ঘুরে হয়রান হয়ে পড়ে। মানবেন্দ্র তাকে অনবরত ধমকাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বেহালার সখেরবাজার ছাড়িয়ে একটা ফাঁকা রাস্তায় ট্যাক্সিওয়ালা ও তার সহকারী মানবেন্দ্রকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দেয় রাস্তায়। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, তবু মানবেন্দ্র দাড়ি চেপে ধরেছিলেন ড্রাইভারের। তার সহকারী তখন একটা লোহার ডাণ্ডা

দিয়ে মারল তার ঘাড়ে। তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন, তবু এত বেশি জেদ, ভয় পেলেন না, বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, তোমাদের গাড়ির নম্বর আমি দেখে রেখেছি, তোমাদের সহজে ছাড়ব না। তখন তারা দুজনে মানবেন্দ্রকে একেবারে মেরে ফেলাই মনস্থ করে। মেরেই ফেলত, কিন্তু ঠিক সেই সময় উলটো দিক থেকে আর একটা ট্যাক্সি এসে থামে। সেই ট্যাক্সির ড্রাইভার কেন যে অকারণে দয়ালু হয়, তার কারণ বোঝা যায় না। সে অন্য দুজনকে নিবৃত্ত করে নিজের ট্যাক্সিতে মানবেন্দ্রকে তুলে নিয়ে যায় এবং হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুইয়ে রাখে। পরে মানবেন্দ্র প্রথম ট্যাক্সির নাম্বার ধরে ড্রাইভারকে ঠিক খুঁজে বার করেছিলেন ঠিকই। ক্ষমা চাইবার জন্য। দুজনেই দুজনের কাছে ক্ষমা চায়।

আর একবার মানবেন্দ্র বিষম দারিদ্রের মধ্যে পড়েছিলেন। তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি। কোনও দিক থেকেই কোনও রোজগারের আশা নেই। মাস আষ্টেক আগে রাগারাগি করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর কিছু জোটাতে পারেননি। প্রকাশকদের কাছেও প্রাপ্য নেই কিছু। অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতার জন্য কারুর কাছ থেকে ধার চাইতেও পারেন না। সেই সময় হঠাৎ রাস্তায় একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। স্কুল-জীবনের বন্ধু। তারপর বহু বছর দেখা হয়নি, এখন সে একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে মোটমুটি বড় চাকরি করে। সে বলল, তোকেই আমি খুঁজছিলাম রে, মানবেন্দ্র। তুই তো আজকাল লিখিস-টিখিস, নামটাম হয়েছে, আমাদের কোম্পানির জন্য একটা ছোট বিজ্ঞাপনের ছবির স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে পারবি? কাজটা এমন কিছু নয়, হাজার আড়াইয়ের মতো টাকা পাবি।

তখন অন্তত দুহাজার টাকারই বিশেষ দরকার ছিল। এই রকম আরও অনেকবার হয়েছে। তার বিশ্বাস ছিল, সঙ্কটের সময় কেউ না-কেউ এসে যাবে। কিন্তু অসুখের ব্যাপারে তো কেউ এ-রকম সাহায্য করতে পারে না। এখন যেন মনে হচ্ছে, মানসীই এসেছে তাকে বাঁচাতে।

বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মানবেন্দ্র বললেন, মানসীকে আমার চাই। কিন্তু মানসীর স্বামী আছে, সন্তান আছে। চাইলেই-বা তাকে পাওয়া যাবে কী করে? পাওয়া মানে কী-রকম পাওয়া?

মানবেন্দ্র স্নানের জন্য জামা-টামা খুলতে লাগলেন। নিজের শরীরটার দিকে তাকিয়ে মায়া হল। চোখের নিচে গাঢ় কালি পড়েছে। দুচোখের পাশেই কাকের পায়ের ছাপ। মেদ জমেছে গায়ে। দিনের পর দিন উপুড় হয়ে শুয়ে লিখে লিখে জীবনীশক্তি ক্ষয় করেছেন। তাতে পৃথিবীর কোনও উপকার হয়নি। এবার পৃথিবী বুঝি বিদায় করতে চাইছে তাকে। না, আমি সহজে যাব না।

নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, যতই চালাকি করো আমি কিছুতেই বুড়োহচ্ছি না। তুমি, মানবেন্দ্র, তোমার হাত দিয়ে মানসীকে ছুঁয়েছ। এর মর্যাদা রাখতে হবে।

হঠাৎ আবার তার খটকা লাগল। মানসী কি তার ঘরে একটু আগে সত্যিই এসেছিল? নাকি এটা তার চোখের ভুল? চঞ্চলকে যেমন তিনি ভুল দেখেছিলেন। আসলে কোনও একজন বন্ধুর জন্য তার মনটা বোধহয় আঁকুপাঁকু করছে। মানসী কি তার বন্ধু হবে।

মানসী সত্যিই এ ঘরে এসেছিল কি না এর প্রমাণ নেবার জন্য মানবেন্দ্র বাথরুম থেকে ওই অবস্থাতেই ফিরে এলেন ঘরে। মানসীর রেখে যাওয়া গন্ধটা নেওয়ার চেষ্টা করলেন। ঠিক যেন পেলেন না। তিনি হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। সত্যি এসেছিল? চোখের ভুল নয়?

জানলার পাশ থেকে ফুলটা মাথা দুলিয়ে বলল, আমি সব দেখছি! আমি সব দেখছি।

তখন মানবেন্দ্রর খেয়াল হল, তার শরীরে একটুও সুতো নেই। বাইরের দরজাটা খোলা। আরে, সত্যি কি আমি পাগল হয়ে গেলাম নাকি! মানবেন্দ্র দৌড়ে এসে দরজাটা বন্ধ করলেন, তারপর ফুলটাকে বললেন, তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ তো!

তিনি জানলার কাছে এসে বললেন, তুমি তো সব দেখেছ, তুমি বলো তো, একটু আগে মানসী কি এ ঘরে এসেছিল?

দেয়ালে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। মানবেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে দেখলেন বেহুলা। কোনও কথার মাঝখানে টিকটিকি ডেকে উঠলে নাকি সেই কথাটা সত্যি হয়। কিন্তু এটা তো একটা প্রশ্ন। যাই হোক, ও বোধহয় বলছে, আমার ধারণাটাই সত্যি। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ বেহুলা।

তারপর ফুলটার চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি কী সুন্দর! তোমাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। মানবেন্দ্র আবার বাথরুমে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বললেন, ভণ্ড কোথাকার! নিজের কাছেও মিথ্যে না বললে চলে না?

৫-৬. বিকেলবেলা

সে-দিন বিকেলবেলা অসীম তাকে ডাকতে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলল, আমরা চা খাচ্ছি। আপনি আসবেন নাকি!

মানবেন্দ্র শুকনো ভাবে বললেন, আমি একটু আগে চা খেয়েছি।

অসীম তৎক্ষণাৎ বলল, ও। আমি কি আপনাকে ডিসটার্ব করলাম? আপনি কি লিখছিলেন?

না, কিছুই করছিলাম না।

আপনাকে সারা দিন ঘর থেকে বেরুতেই দেখিনি।

এমনিই, বই-টই পড়ছিলাম।

অসীমের পাশে এসে মানসী দাঁড়াল। মানসী একটা ঝলমলে ছাপা সিল্কের শাড়ি পরেছে, তার ছিপছিপে শরীরটাকে দেখাচ্ছে মোমবাতির আলোর মতো।

মানসী বলল, আমরা ঝরনা দেখতে যাচ্ছি। আপনি যাবেন?

মানবেন্দ্র বললেন, আমি তো ঝরনাটা আগেই দেখেছি।

মানসী হেসে ফেলল। তার হাসিমুখটা একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো হয়ে গেল মানবেন্দ্রর চোখে।

হাসতে হাসতেই মানসী বলল, ঝরনা বুঝি একবার দেখলে আর দুবার দেখা যায় না? চলুন না আমাদের সঙ্গে।

অসীম তার স্ত্রীকে বলল, না না, শুধু শুধু ওনাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছ কেন? ওঁর দেখা আছে যখন...।

মানসী বলল, আর একবার গেলে কী হয়েছে?

মানবেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মানসী যা বলছে, তা তো অনুরোধ নয়। হুকুম। এ অগ্রাহ্য করার উপায় আছে নাকি তার? মানসী এত জোর পেল কোথা থেকে?

মানবেন্দ্র বললেন, আচ্ছা চলুন, আমিও ঘুরে আসি। আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

আমরা বাগানে বসে ততক্ষণে চা-টা খেয়ে নিচ্ছি।

ওরা দুজনে চলে যাবার পরই মানবেন্দ্র সুটকেসটা খুলে জামাকাপড় বার করতে গেলেন। সব কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন ব্যস্তভাবে। ছেলেমানুষের মতো কোনও জামাকাপড়ই তার পছন্দ হচ্ছে না। মানসী নিজে থেকে তাকে ডেকেছে, বিশেষ পোশাকে যেতে হবে না? ইস, ভাল কিছু জামা টামা আনাই হয়নি।

শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্র এক জোড়া কাচা প্যান্ট-শার্ট পরে নিলেন, তার ওপর একটা বুক-খোলা সোয়েটার। অনেক দিন বাদে মোজার সঙ্গে শু পায়ে দিলেন। তারপর নবীন যুবকের মতো হালকা পায়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। অসীমদের সঙ্গে তার বয়েসের তফাত বেশি না, ছসাত বছর হবে, কিন্তু ওরা তাকে বেশি সম্ভ্রম দেখিয়ে ভারিক্কি করে তুলছে।

বাগানে বাচ্চারা একটা রবারের বল নিয়ে খেলছিল, এখন বড়রাও মেতে উঠেছে এই খেলায়। অসীম, গৌতম, হিরন্ময় এমনকী অনুরাধা এবং মানসীও শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে হুড়োহুড়ি করছে সারা মাঠ জুড়ে। অসীম বলটাকে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছোটাচ্ছে এ-দিক ও-দিক, সহজে কেউ ধরতে পারছে না। সবাই চ্যাঁচাচ্ছে, এই আমাকে দাও, আমাকে দাও!

একটি সুন্দর প্রাণবন্ত যৌবনের ছবি। যে-পৃথিবীতে দারিদ্র আছে, ক্ষুধা আছে, নোংরামি আছে, তার সঙ্গে এই মাঠের ছবিটির কোনও মিল নেই। এমনকী, মায়ের কোলে শিশু,

আর্ত-আতুরের পাশে সেবাপরায়ণা নারী, প্রেমিকের কণ্ঠলগ্ন প্রেমিকা কিংবা ডানামেলা পাখি প্রভৃতি প্রথাগত সুন্দর দৃশ্যের চেয়েও এই যৌবনের ছবিটি বেশি সুন্দর।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখে মানবেন্দ্র ঠিক করলেন, তিনিও খেলায় যোগ দেবেন। অনেক দিন ছুটোছুটি করা হয়নি। শরীর থেকে ঘাম ঝরলে বেশ একটা আনন্দ পাওয়া যায়।

তিনি বারান্দা ছেড়ে বাগানে পা দিতেই খেলা থেমে গেল। হিরন্ময় চেঁচিয়ে বলল, এই চলো চলো, আর খেলা না। এখন না বেরুলে দেরি হয়ে যাবে। উনি এসে গেছেন।

মানবেন্দ্র একটু দুঃখিত হলেন। ওরা তাকে খেলায় নিল না।

গৌতম এ-দিকে সোজা হেঁটে এসে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি হেঁটেই যাব, না গাড়ি নিতে হবে?

মানবেন্দ্র বললেন, হেঁটে যাওয়াই তো ভাল। গাড়ি তো শেষ পর্যন্ত যাবেও না।

আপনাকে বোধহয় জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

না না, আমিই আজ আপনাদের পথ-প্রদর্শকহতে চাই।

বাচ্চাদের সামলে জিনিসপত্তর গোছগাছ করে নিতে আরও মিনিট পাঁচেকসময় লাগল। তারপর বেরিয়ে এল টুরিস্ট লজের বাইরে।

সেখানে মুনিয়ার মা হল্লা লাগিয়ে দিয়েছে। মাথায় একটা খালি টুকরি, মুনিয়ার মা যুদ্ধং দেহি ভাবে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে মুনিয়া নেই। তাকে ঘিরে দুতিন জন বেয়ারা তার সঙ্গে মশকরা করছে।

মুনিয়ারমা সকালবেলা টম্যাটো দিয়ে গেছে, দুটাকা ছআনা তার প্রাপ্য। সকালবেলা তাকে বলা হয়েছিল, খুচরো পয়সা নেই, দামটা পরে নিতে। বিকেলবেলাও তাকে বলা হচ্ছে দশ টাকার খুচরো নেই, এখন দাম দেওয়া যাবেনা। এ কী-রকম ব্যবহার! সে কি

শেঠদের মতো কারবার করে যে, দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে দিতে পারবে? দুটাকা ছআনা না পেলে সে চাল কিনবে কী করে? তার ন্যায্য পয়সা এক্ষুনি চাই।

বেয়ারারা ক্ষেপাচ্ছে তাকে। তাদের নিজস্ব ভাষায় বলছে, আরে, আমরা কি পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি নাকি? পয়সা তোমার ঠিকই পাবে।

মুনিয়ার মা বলছে, না, আমার পয়সা আজই দিয়ে দাও। কাল পর্যন্ত বাঁচি কি মরি তার ঠিক কী? আজ না খেতে পেলে কাল বাঁচব কী করে? গভর্নমেন্টের হোটেলকে কোনও বিশ্বাস নেই।

মুনিয়ার মা এত জোরে চিৎকার করে কথা বলছিল যে, সেদিকে না তাকিয়ে উপায় নেই। ওরা একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়াল, তারপর এগিয়ে গেল। বেশ কিছুটা দূর আসার পরও মুনিয়ার মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে।

অসীম ছিল মানবেন্দ্রর পাশেই, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, আমার কাছে খুচরো টাকা আছে, ওকে দিয়ে আসি, পরে বিল থেকে বাদ দিলেই হবে। ওই মেয়েটির বোধহয় পয়সাটার খুবই দরকার।

অসীম হনহন করে ফিরে গেল টুরিস্ট লজের দিকে। মানবেন্দ্র অন্য কথা চিন্তা করছিলেন বলে মুনিয়ার মায়ের ব্যাপারটাতে তিনি গুরুত্ব দেননি।

তিনি সপ্রশংস ভাবে তাকিয়ে রইলেন অসীমের চলে যাওয়ার দিকে। মানবজাতির মধ্যে এই শ্রেণীর মনুষ্য খুবই বিরল, যারা যে-কোনও ব্যাপারেই চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সব কাজই একটু পিছিয়ে দেওয়া, আচ্ছা আজ থাক, কাল এটা করব- এই রকম। একমাত্র নিজের মৃত্যুভয়ের সামনে ছাড়া। মানবেন্দ্রর জীবনেও পথেঘাটে এমন অনেক ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে-যখন তার মনে হয়েছিল একটা কিছু করা উচিত, সামান্য কিছু-কিন্তু ভাবতে ভাবতেই আসল সময়টা পেরিয়ে গেছে, কিছুই করা হয়নি। মুনিয়ার মায়ের ব্যাপারটা নিয়েই হয়তো তিনি রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে

ভাবতেন, ইস, ওকে কেন দুটাকা ছআনা নিজের পকেট থেকে দিলাম না। এই ধরনের অনুশোচনায় বিবেক খুব আদর খায়!

অসীম ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। এবং এইটুকু ঘটনার জন্য তিনি তার মনের মধ্যে অসীমকে একটা বিশিষ্ট জায়গা দিলেন।

তিন মাইল রাস্তা বিকেলে বেড়াবার পক্ষে খুব কম নয়। শহরের বিপরীত দিকে বেশকিছুটা লাল সুরকির রাস্তা, তারপর হালকা জঙ্গল। বনবিভাগ থেকে নতুন ইউক্যালিপটাস ও শালগাছ লাগানো হয়েছে। পর পর অনেক গাছ, কিন্তু একে ঠিক বনও বলা যায় না, বাগানও বলা যায় না।

অসীম জিজ্ঞেস করল, আপনি এই জায়গাটার সন্ধান পেলেন কী করে?

মানবেন্দ্র বললেন, ডাকবাংলোর বেয়ারাদের কাছে শুনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলাম।

আপনি অনেক জায়গা ঘুরেছেন, না?

কিছু জায়গা ঘুরেছি, আরও বহু জায়গা দেখা বাকি আছে।

আপনাদের তো সারা বছরই ঘুরে বেড়াতে হয়?

কেন, ঘুরে বেড়াতে হবে কেন?

লেখার মেটিরিয়াল সংগ্রহ করার জন্য।

মানবেন্দ্র সামান্য হেসে বললেন, ওষুধ কোম্পানির এজেন্টদের যেমন অর্ডার সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়, আমাদের অবশ্য সেরকমভাবে ঘুরে বেড়াবার কোনও দরকার নেই। লেখার মেটিরিয়াল নিজের ঘরে বসেও পাওয়া যায়।

অদূরে হিরন্ময় অনুরাধা আর মানসীকে হাত পা নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে। আর হাসিতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে দুই নারী। গৌতম সামলাচ্ছে বাচ্চাদের। সেই দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র ভাবলেন, মানুষের কোনও ভূমিকাটাই সঠিক নয়।

বনের মধ্যে এক জায়গায় বড় বড় পাথরের চাই। পাথর নয়, কেউ যেন ভীমাকৃতি পাথরগুলো এলোমেলো ভাবে ছুঁড়ে ফেলে গেছে এখানে। তারই মাঝখান দিয়ে মাটি খুঁড়ে উঠেছে ঝরনাটা। ঝরনার উৎস মুখটা দেখা যায় না ঠিক, সেটা চাপা পড়েছে বিরাট একটা পাথরের তলায়। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, মাটি থেকে বেরুবার খানিকটা পরেই সেটা বেশ চওড়া হয়ে গেছে, অন্তত বারো চোদ্দো ফুট, বেশ তেজ আছে স্রোতের। এক জায়গায় খানিকটা প্রপাতের মতোও সৃষ্টি হয়েছে।

জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন। অসংখ্য ফড়িং ওড়াওড়ি করছে মাথার ওপরে। ঝরনার শব্দ শুনলেই ফড়িঙেরা ভাবে, ওখানে বুঝি আরও ফড়িঙের ঝাঁক আছে। এইভাবে তারা সবাই এসে জড়ো হয়।

হিরন্ময় হাততালি দিয়ে বলল, গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড জায়গাটা! আমরা তো দুপুরে এখানে এসে পিকনিক করতে পারতাম।

মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, না, পারতে না। আমি তোমাদের বাধা দিতাম।

অনুরাধা মানবেন্দ্রর পাশে এসে বলল, অনেক নামকরা জায়গার চেয়েও এই জায়গাটা ভাল।

মানবেন্দ্র শুধু হাসলেন।

অনুরাধা আবার বলল, এ-রকম নির্জন জায়গা দেখলে মনে হয়, সারা জীবন এখানে একা একা থাকি। কেউ ডিসটার্ব করবে না।

মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, আমি আগের দিন এসে দেখেছি রাখালরা এখানকার জলে তাদের মোষগুলোকে চান করাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখলে আপনার একটুও ভাল লাগত না।

মানবেন্দ্র মুখে বললেন, আপনি এই পাথরটার ওপরে বসুন, পা দুটো ডুবিয়ে দিন জলে, আপনাকে খুব সুন্দর মানাবে।

মানবেন্দ্র যেন মানসীর হুকুমে অনুরাধাকে খুশি করার জন্য বলছেন এইসব কথা।

অনুরাধা খুশিই হল। কুন্দফুলের মতো দাঁতের পাটি দিয়ে নিচের ঠোঁটের ভেতরটা একবার কামড়াল। এটা তার মুদ্রাদোষ। কিংবা এই সময় তাকে আরও সুন্দর দেখায়, সে জানে। সে বলল, আপনিও আসুন না, আপনিও বসবেন আমার সঙ্গে।

আমি? না, আপনি একা বসুন, তারপর ওদের কারুকে বলুন আপনার একটা ছবি তুলতে।

সে হবে এখন। আপনি আসুন, আপনার সঙ্গে বসতেই আমার ইচ্ছে করছে।

অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মানবেন্দ্রর মনে পড়ে গেল সোয়ানস ওয়ের দুটো লাইন। কানট ইউ সি হাউ ম্যাচ অফ ইয়োর অ্যাট্রাকশন ইউ থ্রো অ্যাওয়ে হোয়েন ইউ স্টুপ টু লাইং? কথাটা সোয়ান বলেছিল ওদেতকে, আজ দুপুরেই মানবেন্দ্র পড়েছেন।

মানবেন্দ্র দেখলেন, মানসী অনেক দূরে। গৌতমের কাছ থেকে বাচ্চাদের ভার নিয়ে নিয়েছে, বাচ্চাদের নিয়ে সে এখন জলের ধারে। গৌতম, অসীম ও হিরন্ময় আর একটা বড় পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরিয়েছে। মানবেন্দ্র লক্ষ্য করেছেন গৌতম তার স্ত্রীর কাছাকাছি থাকেনা।

মানবেন্দ্র অনুরাধাকে বললেন, আসুন।

পাথরটার ওপরে ওঠা সহজ। তবু অনুরাধা কৃত্রিম ভয়ে টল টল করছে। যেন সে আশা করেছিল, মানবেন্দ্র তার হাতে ধরবেন। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানবেন্দ্র যে-হাতে

মানসীকে ছুঁয়েছে আজই সকালে, সেই হাতে আর অনুরাধাকে ছুঁতে চান না। মানবেন্দ্রর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল অনুরাধা, সেই হাতটা শূন্যেই রইল। যাই হোক, কোনও রকমে সে বসল জলের ধারের ঢালু দিকটায়। জলে পা দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, উরেঃ বাবা, কী ঠাণ্ডা!

শীতকালে ঝরনার জল তো ঠাণ্ডা হবেই। অনুরাধা যদি মানবেন্দ্রর বান্ধবী বা বন্ধুপত্নী হত, তাহলে মানবেন্দ্র ওকে জোর করে জলে নামিয়ে দিতেন এখন। কিন্তু মাত্র দুদিনের পরিচয়, এমন কৌতুক করা যায় না।

অনুরাধা চটি জোড়া খুলে রেখেছিল পাশে, তারই হাতের ধাক্কায় একটা চটি পড়ে গেল জলে। স্রোতে ভাসতে লাগল। অনুরাধা চেঁচিয়ে উঠল, এই যাঃ, চটি পড়ে গেল যে। হিরন্ময়, এই হিরন্ময়, দেখো না–

মানবেন্দ্র বেশ মজা পেলেন। চটি জলে পড়ে গেলে অনুরাধা তার স্বামীকে ডাকে না, সে ডাকে অপর পুরুষকে।

গৌতমই কিন্তু দৌড়ে এল এ-দিকে।

সে এসে পৌঁছবার আগেই মানবেন্দ্র ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে চটিটা ধরে ফেলেছেন।

গৌতম এসে অনুরাধাকে বলল, এ কী, জলের এত কাছে বসেছ কেন? তুমি নিজেই পড়ে যাবে যে!

অনুরাধা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাসীন গলায় বলল, পড়ে গেলেই-বা কী আর হবে তাতে!

অর্থাৎ দুপুরবেলা স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া মিটিয়ে নেবার এই তো উপযুক্ত স্থান। মানবেন্দ্র বুঝলেন, তার আর এখানে থাকা উচিত নয়।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অন্য দিকে পা বাড়িয়ে গৌতমকে বললেন, এখানে কোথাও ডুব-জল নেই। হঠাৎ পড়ে গেলেও ভয়ের কিছু নেই তাতে।

গৌতম বলল, ওইদিকের পাথরটা বেশ পরিষ্কার আছে, আসুন সবাই মিলে এক জায়গায় বসি।

অনুরাধা উঠল না।

গৌতম বলল, এসো।

অনুরাধা আবার গম্ভীর ভাবে বলল, আমার এখানে বসতেই ভাল লাগছে। আমি এখানে ওঁর সঙ্গে থাকব।

এই বলে সে মানবেন্দ্রর বাহুতে হাত ছোঁয়াল। তারপর হেসে আবার বলল, আমি জলে পড়ে গেলে আপনি আমাকে ধরবেন না?

মানবেন্দ্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন।

আর কিছু না বলে ওদের দুজনকে সেখানে কথা কাটাকাটির জন্য রেখে মানবেন্দ্র পাথরটা থেকে নেমে এলেন। হঠাৎ একটু বোকা বোকা লাগছে তার। এদের মধ্যে তার কোনও জায়গা নেই। তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না।

অনুরাধার ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলেই সে মানবেন্দ্রকে তার পাশে এসে বসবার জন্য এত করে বলছিল। সেই জন্যই ডাকছিল হিরন্ময়কে। এটা পুরনো কায়দা। গৌতম ছেলেটি অন্য ধরনের, তাকে এইভাবে উত্তেজিত করা যায় না বোধহয়। অনুরাধা তার স্বামীকে ঠিক চেনে না।

অনেক দিন আগে একটি মেয়ে মানবেন্দ্রর কাছে প্রায়ই আসত। মেয়েটির নাম ছিল সুস্মিতা। সুস্মিতাই তো? হ্যাঁ। খুব অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল তার। সে তার নিজের কথা

বলতে ভালবাসত খুব। অর্থাৎ তার নিজস্ব কিছু দুঃখের কথা কোনও এক জনের কাছে মন খুলে বলার দরকার ছিল। সেরকম মানুষ পায়নি, তাই এসেছিল এক জন লেখকের কাছে।

সুস্মিতার কথা শুনে মনে হত, তার স্বামী একটি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। তার প্রধান শখ, রাত্তিরবেলা স্ত্রীর পাশে শুয়ে গল্প বলা, জীবনে এ পর্যন্ত কটি মেয়েকে সে ভালবেসেছে এবং তাদের জন্য তার কতখানি কষ্ট হয়। লোকটিকে চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়, মাসের অর্ধেক দিন বাইরে থাকে, সেই সব সময় দুএকটি নারী সমন্বিত রাত্রি কাটানো অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে সেই সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়াতেই ওর বেশি আনন্দ। সুস্মিতা কাঁদলে সে হো-হো করে হাসে। সুস্মিতা না কেঁদে শান্তভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করলে সে গালাগালির ঝড় তুলতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত একটা চাবুক নিয়ে মারে। সুস্মিতার কোনও বাপের বাড়ি নেই। নিজের এবং ছেলের ভরণপোষণের কথা চিন্তা করেই সে দরকার মতো কাঁদে কিংবা অন্যের কাছে দুঃখের কথা জানাতে হয়।

মানবেন্দ্রর বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি যে, লোকটি একটি সেডিস্ট। সমাজ এদের কোনও শাস্তি দিতে পারে না। যে লোক তার স্ত্রীকে দুবেলা খেতে-পরতে দেয়, সে তার শয়নকক্ষে স্ত্রীকে অপমান করছে কিংবা চাবুক মারছে কি না সমাজ তা জানতে চায় না। আদালত কোনও নির্দেশ দিতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে চাবুকের দাগ প্রমাণ করতে হবে। অপমানের কোনও দাগও থাকেনা।

কিছু একটু বলতে হবে বলেই মানবেন্দ্র বলেছিলেন, ভারি অদ্ভুত তো!

সুস্মিতা বলেছিল, দিনেরবেলা ওকে দেখলে কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। এমন ভদ্র ব্যবহার, লেখাপড়া জানে, সববিষয়ে কথা বলতে পারে, আপনার বই-টইও পড়ে। আপনারা সাহিত্যিকরা এই সব লোককে বদলে দিতে পারেন না?

মানবেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। এক জন লেখকের কোনও ক্ষমতাই নেই। সে ডাক্তার নয়, বিচারক নয়, মন্ত্রী নয়। সে বড় জোর মানুষের দুঃখের সঙ্গী হতে পারে, আর কিছু না।

মানবেন্দ্র বলেছিলেন, আমি আমার নিজের জীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান করতে পারিনি।

এই সুস্মিতা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এসে ঝুলোঝুলি করেছে। নিজেই তারিখ ঠিক করে গেছে, মানবেন্দ্র যাননি, পরে এসে সুস্মিতা জানিয়েছে যে, তার খাবার নষ্ট হয়েছে। সে চায়, মানবেন্দ্র একবার অন্তত তার স্বামীকে দেখুক। ডাক্তার দেখাবার বদলে এক জন লেখককে ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্রকে এক দিন যেতেই হয়েছিল। সুস্মিতা আগে থেকেই একটা দিন বলে গিয়েছিল, সেই দিনটাতে সে মানবেন্দ্রকে দুপুরবেলা টেলিফোন করে বলেছিল, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি, আপনি তা-ও আসবেন না? তাহলে কিন্তু আমরা ট্যাক্সি করে গিয়ে আপনাকে ধরে নিয়ে আসব।

সুস্মিতাদের বাড়ি টালিগঞ্জে। মানবেন্দ্র সেখানে পৌঁছে দেখলেন বাড়িতে সুস্মিতা একা। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার স্বামী কোথায়?

সুস্মিতা অদ্ভুত ভাবে হেসে বলেছিল, আমি জানি, আপনি অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করা পছন্দ করেন না। ও দুদিন আগে পাটনায় গেছে।

বেশ একটা পরিকল্পনা করেই সুস্মিতা মানবেন্দ্রকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। এমনকী ছেলেকেও পাঠিয়ে দিয়েছে এক বান্ধবীর বাড়িতে। শোবার ঘরে ডেকে এনে পরিপাটি বিছানাটা দেখিয়ে মানবেন্দ্রকে বলল, বসুন।

মানবেন্দ্রর চরিত্রে বিন্দুমাত্র নীতিবাতিক নেই। তিনি মনে করেন, স্বয়মাগতা কোনও নারীকে ভোগ করার মধ্যে অন্যায় কিছু থাকতে পারে না। সুস্মিতার চেহারাও খুব খারাপ নয়। একটুক্ষণের জন্য মানবেন্দ্র প্রলুব্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু জুতো খুলে বিছানার ওপর পা তুলে বসতে গিয়ে তার একটু খটকা লাগে। তিনি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ, তাই অন্যদের ব্যবহারের সামান্য অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করার ক্ষমতাও ছিল খুব বেশি। তার মনে হয়েছিল, শুধু সুস্মিতার স্বামী নয়, সুস্মিতার নিজের চরিত্রেও খানিকটা পাগলামি আছে। সে মানবেন্দ্রকে শুধু শারীরিক আনন্দের জন্যই ডেকে আনেনি। পাগলদের সংসর্গে এলেই গা-টা কীরকম ছম ছম করে। সুস্মিতা যখন তাকে প্রথম চুম্বনটি দিতে আসে, তখন তার মনে হয়েছিল বিষকন্যাদের কথা। তিনি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে জুতো পায়ে দিয়েছিলেন। রীতিমতো ভয়ে বুক কাঁপছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্মিতার স্বামী এসে পড়েছিল। সুস্মিতা দারুণ অবাক ও ভয় পাবার ভাব দেখিয়েছিল। মানবেন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, এটাও ওর ভান। ও জানত ঠিকই।

সুস্মিতার স্বামী মানবেন্দ্রকে এমন খাতির করতে শুরু করে যে, মানবেন্দ্রর মনে হয়েছিল, লোকটি তাকে ব্যঙ্গ করছে। এরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে তার ব্যক্তিত্বটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাইছে।

মানবেন্দ্রর প্রতি সুস্মিতার কোনও ভালবাসা বা টান ছিল না, ছিল শুধু একটা উদ্দেশ্য। তাকে ডেকে এনে স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগানোর চেষ্টা। নিজের ওপরেই ঘেন্না হচ্ছিল তার। এই উদ্দেশ্যে সুস্মিতা তাকে এত দূর টেনে এনেছে। কেন, পাড়ার বেকার ছোকরার কি অভাব? তাদের যে-কোনও এক জনকে প্রেম করতে ডাকলে ছুটে আসত না? সুস্মিতা হয়তো ভেবেছে, বেকার ছোকরা ডেকে আনলে বিপদ হতে পারে, সে যদি তার স্বামীর সঙ্গে মারামারি শুরু করে? এক জন লেখকই হচ্ছে সব চেয়ে নিরীহ মানুষ।

মানবেন্দ্র এত রেগে গিয়েছিলেন যে, পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে তৎক্ষণাৎ সুস্মিতা আর তার স্বামীকে খুন করে ফেললেন। মনে মনে।

মানবেন্দ্র এবারও পিস্তল তুলে নিশানা করতে গেলেন অনুরাধার দিকে। তিনি দেখলেন, গৌতম তখনও অনুরাধাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। মানবেন্দ্র সত্যিই হাতের আঙুলটা পিস্তলের ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন, কিন্তু এখন গুলি করতে গেলে গৌতমের গায়েও লাগবে। কিন্তু গৌতমের ওপরে তার কোনও রাগ নেই। তিনি একটু সরে গিয়ে অনুরাধাকে আলাদা ভাবে দেখবার চেষ্টা করলেন।

পাশে সরতে গিয়ে মানবেন্দ্র দেখলেন, তার সামনে একটা দাগ কাটা। কে যেন চুন দিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত এঁকে দিয়ে গেছে। আগে কি এই দাগটা ছিল?

মানবেন্দ্র সেই দাগটা পার হবার জন্য পা তুলতে গিয়ে অনুভব করলেন, তাঁর পা পাথরের মতো ভারি। কে যেন তাকে ওই দাগটা পার হতে নিষেধ করছে। তাছাড়া চেষ্টা করলেও তিনি পারবেন না, তাঁর পা এত ভারি হয়ে গেছে।

এ কী অসম্ভব ব্যাপার! তিনি একটা দাগ পার হতে পারছেন না। অনুরাধার দিকে অস্ত্র তুলেছিলেন বলেই কি এই গণ্ডি? অস্ত্রটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে মানবেন্দ্র সেই গণ্ডিটা লাফিয়ে পার হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি শরীরকে নড়াতে পারছে না।

মানবেন্দ্র পেছনে ফিরলেন। ওই দিক দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি ভুল দেখেছিলেন। দাগটা তো অর্ধবৃত্তাকার নয়, পুরো বৃত্ত। কেউ তাকে একটা গণ্ডির মধ্যে বন্দি করে গেছে। এখান থেকে তার বেরুবার উপায় নেই।

শীতের মধ্যেও তার কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম দেখা দিল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওরা কেউ জানেনা, তিনি বন্দি। তিনি অসহায় ভাবে তাকালেন, দূরেক বড় পাথরটার ওপরে আস্তে আস্তে সবই জমা হচ্ছে, গৌতম অনুরাধাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ও-দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, মানসী পা ধুচ্ছে ঝরনার জলে, হিরন্ময় লাইটারটা ফটাস ফটাস করে টিপছে, সিগারেট ধরাতে পারছে না, এত হাওয়া। ফড়িংগুলো দুই দুই খেলা খেলছে জলের সঙ্গে। প্রাক্-সন্ধ্যার আকাশ লাল হয়ে এসেছে, তার ছায়া খেলছে জলের সঙ্গে। প্রাক সন্ধ্যার আকাশ লাল হয়ে এসেছে, তার ছায়া পড়েছে জলে। চারিদিকে এত সুন্দর,

অথচ মানবেন্দ্র একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বন্দি। এটা তুচ্ছ করে বেরিয়ে আসার সামর্থ্য তার নেই।

তার হচ্ছে হল, চিৎকার করে অন্য মানুষকে ডাকেন। তোমরা আমাকে বাঁচাও। তোমরা আমাকে বাঁচাও। মানসী, তুমি এসে আমাকে উদ্ধার করো।

কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। বেরুবেই-বা কেন, তিনি তো কারুকে কখনও উদ্ধার করেননি। তিনি স্বার্থপর। দারুণ স্বার্থপর!

মানবেন্দ্র সেখানেই মাটিতে বসে পড়তে যাচ্ছিলেন। তাছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এই সময় দেখতে পেলেন একটা বাচ্চা ছেলেকে। অনুরাধার ছেলে। তার দুহাতে দুটো ললি পপ। লোভীর মতো মানবেন্দ্রর মনে হল, ও কি আমাকে একটা দেবে? ওর তো দুটো আছে!

মানবেন্দ্রকে নিথর ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিশুটি বোধহয় একটু অবাক হল। সে পা দুটো কেষ্টঠাকুরের মতো করে দাঁড়াল সামনে।

মানবেন্দ্র তাকে ডাকলেন, এই শোনো।

ছেলেটি দুপা এগিয়ে এসে বলল, কী?

মানবেন্দ্র তার মাথাটা ছুঁয়ে ফেললেন।

অমনি তার শরীর ঝিম ঝিম করে উঠল। যেন হঠাৎ জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। মানবেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন, গণ্ডি-ফণ্ডি কিছুই নেই। তিনি আবার দৃষ্টিবিভ্রম অসুখে ভুগছিলেন। ছেলেটির হাত ধরে তিনি কয়েক পা এগিয়ে গেলেন।

অনুরাধা ও গৌতমের ছেলে তাকে গণ্ডি থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেল।

মানবেন্দ্রর ভয়টা কাটেনি। আজ সারা দিন তিনি সুস্থ ছিলেন। কোনও ব্যবহারে ভুল হয়নি। হঠাৎ এ আবার কী হল! যেন কোনও মন্ত্রে তার পা মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল। অনুরাধাকে খুন করতে চেয়েছিলেন বলেই কি?

শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। ওদের কিছু টের পেতে দেওয়া ঠিক হবে না। আচার-ব্যবহারে যদি কোনও অসঙ্গতি বেরিয়ে পড়ে। তিনি ওদের থেকে উলটো দিকে হাঁটতে লাগলেন। একটু বাদেই চলে গেলেন বড় পাথরটার আড়ালে। কেউ বোধহয় তার নাম ধরে ডাকছে। তিনি গ্রাহ্য করলেন না।

আরও খানিকটা দূরে, ঝরনার উৎস যে জায়গাটায়, তার কাছাকাছি মানবেন্দ্র বসে পড়লেন। এখান থেকে ওরা তাঁকে দেখতে পাবে না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাতে গেলেন। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তার হাত কাঁপছে। এই হাত কাঁপার লক্ষণটা ভাল নয়। কোনও কালে তো তার স্নায়ুর অসুখ ছিল না।

জলের ধারে একটা ছোট চারা গাছ। সেই গাছ ও পাথরের মধ্যে জাল বিস্তার করে একটা মাঝারি-আকারের মাকড়শা বসে আছে। মানবেন্দ্র দেখলেন, মাকড়শাটা ঠিক তাকিয়ে আছে তার দিকেই। আশ্চর্য, মাকড়শার মুখ কি অবিকল মানুষের মতো দেখতে হয়।

মানবেন্দ্র মাকড়শাটার দিকে ভুরু নাচালেন।

মাকড়শার দৃষ্টি স্থির, অবিচল।

মানবেন্দ্র বললেন, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়নি, আমার নাম মানবেন্দ্র মজুমদার। আমি এক জন ব্যর্থ মানুষ। হেরে যাওয়া মানুষ।

মাকড়শাটা জায়গা ছেড়ে একটুও নড়ল না।

মানবেন্দ্র আবার বললেন, আমার যখন এগারো কি বারো বছর বয়েস, তখন আমি একটা মাকড়শা মেরেছিলাম। আমি মাকড়শা জাতটাকেই ঘৃণা করতাম। এখন আর করি না। আপনার ভয় নেই।

কোনও উত্তর না পেয়ে মানবেন্দ্র বিরক্ত হলেন। মাকড়শাটার এই ভারিকি প্রশান্ত ভাব তার সহ্য হল না। মাকড়শাটা তো আর প্রজাপতি কিংবা মথের মতো সুন্দর নয় যে, উত্তর না দেবার অধিকার থাকবে।

তিনি একটা শুকনো ডাল তুলে মাকড়শাটাকে খোঁচা মারতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার কানে ভেসে এল মানসীর গান। মানসী একটু আগে থেকেই গাইছে, মানবেন্দ্র এইমাত্র খেয়াল করলেন।

হাতের কাঠিটার দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন, আমি এ কী ছেলেমানুষী করতে যাচ্ছিলাম, শুধু শুধু মাকড়শাকে খোঁচা মারা? আমার কি বয়েস বারো? একটু আগে অনুরাধার ছেলের হাতে ললি পপ দেখে আমার খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। সত্যি কি পাগল হয়ে গেলাম নাকি?

তার বদলে মানসীর গানের দিকে মন দেওয়া যাক। দুদিন ধরে বিভিন্ন সময় মানসীর গলার টুকরো টুকরো গান শুনে তিনি গানের কথাগুলো নতুন ভাবে যাচাই করছেন। এতে অন্য দিকে মন ফেরে।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই
ওগো ভিখারি আমার ভিখারি
চলেছ কী কাতর গান গাই।
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে–
ভিখারি আমার ভিখারি...

মানবেন্দ্রর ডান হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। তিনি আপন মনে বললেন, কোনও শুয়োরের বাচ্চার সাধ্য নেই, এ-রকম গান লেখে। ভিখারি আমার ভিখারি -এই জায়গাতেই দারুণ ভাবে মেরে দিয়েছে বুড়ো। দুজনেই ভিখারি। এক জন সব দিয়েছে, এক জন সব পেয়েছে, তবু দুজনেই ভিখারি। রবীন্দ্রনাথের মতো অত বড় প্রেমিক তো আর এক জনকেও দেখলাম না।

এ-ও কি শরীর ছাড়া প্রণয়? কী জানি, হতেও পারে। আমি তার স্বাদ পেলাম না। রয়ে গেলাম নিচুতেই। হায়, আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই- পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেওয়া-নেওয়ার কথা আমার কখনও মনে পড়েনি। আমি শুধু চেয়েছি, কিছু দিইনি, দেবার মতো কিছু নেই ভেবে। ভিখারি আমার ভিখারি গানের মাঝখানে হঠাৎ এই জায়গাটা শুনলেই কান্না পেয়ে যায়।

কখন গান শেষ হয়ে গেছে, অন্য গান শুরু হয়েছে, তা-ও থেমেছে একসময়, মানবেন্দ্রর খেয়াল নেই। তিনি ভিখারি আমার ভিখারি-এই সামান্য শব্দকটা নিয়ে ঝিম হয়ে বসে আছেন। কিংবা যেন ধ্যান করছেন।

আপনি এখানে একা একা বসে আছেন কেন?

মানবেন্দ্র চমকে মুখ তুলে তাকালেন। মানসী এসেছে। আজ বিকেলে বাইরে বেরুবার পর মানসী এতক্ষণ তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। অথচ সেই তো ডেকে এনেছিল মানবেন্দ্রকে। এখন মানসী একা এসেছে এখানে, এর নিশ্চয়ই কোনও মানে আছে।

মানসী আবার বলল, আমি তখন আপনাকে ডাকলাম।

ধরা-পড়া চোরের মতো মানবেন্দ্র অসহায় কাতর চোখে তাকালেন।

মানসী সামান্য হেসে বলল, আপনি আমার গান না শুনে চলে এসেছেন, তাতে আমি কিছু মনে করিনি।

মানবেন্দ্র বলতে চাইলেন, আমি এর আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত এ-রকম মন দিয়ে কখনও শুনিনি। সত্যিই শুনিনি।

কথাটা উচ্চারণ করলেন না লাজুক ভাবে তাকিয়ে রইলেন মানসীর মুখের দিকে। সন্ধ্যার লাল আলোয় মানসীকেও অরুণবর্ণ দেখাচ্ছে। তার ছিপছিপে শরীরটা মানবেন্দ্রর চোখ থেকে আড়াল করেছে দিগন্তকে। মানসীর কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা চামড়ার ব্যাগ। তার স্ট্র্যাপটা চলে এসেছে মানসীর বুকের ওপর দিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র যেন শিউরে উঠলেন। এই রূপ, আমি এর পূজা করব। মানসী তুমি দাঁড়াও, আমি তোমার পায়ের কাছে পুরোহিতের মতো বসি।

মানসী একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, এবার ফেরার সময় হল, ওরা আপনাকে ডাকছে। আপনি কি আরও থাকবেন? কী করবেন এখানে একলা একলা!

তুমি একটু দাঁড়াও।

আপনি তো একা একা নিজের মনে কথা বলছিলেন।

তাই নাকি?

আমি দেখলাম তো দুর থেকে ভেবেছিলাম আপনাকে বিরক্ত করব না।

ওটা আমার পুরনো স্বভাব। ও এমন কিছু না।

চারা গাছটার দিকে তাকিয়ে মানসী বলল, বাঃ এই গাছটা বেশ সুন্দর তো।

মানবেন্দ্র শুকনো ডালটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি মাকড়শাটাকে তাড়িয়ে দিলেন, যাতে মানসী ওটাকে দেখে ভয় না পায়।

মানবেন্দ্র টের পেলেন, তাঁর মাথাটা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ লাগছে। মানসীকে দেখলেই এরকম হয়।

মানসী গাছটাকে দেখবার জন্য নিচু হয়ে বলল, দেখেছেন, এ জায়গাটায় বালির রঙও খুব সুন্দর। সোনার মতো ঝকঝকে। এই বালিতে সোনা মেশানো নেই তো!

কী জানি।

কোনও কোনও নদীর ধারের বালিতে থাকে শুনেছি। যেমন সুবর্ণরেখায়।

তারপর মুখ তুলে মানসী অপ্রত্যাশিত ভাবে বলল, পায়ের নিচে শুকনোবালি, একটু খুঁড়লে জল, গভীরে যাও, গভীরে যাও –

মানবেন্দ্র স্তম্ভিত ভাবে বললেন, এ কী?

চিনতে পারছেন না?

না।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন আপনার এই কবিতাটা বেরিয়েছিল দেশ পত্রিকায়।

মানবেন্দ্র তীব্র চোখে তাকালেন মানসীর দিকে। যেন এক্ষুনি এই রমণীকে তিনি ভস্ম করে ফেলবেন।

মানসী বলল, নিজের লেখাও চিনতে পারেন না? একী, আপনার চোখ-মুখের চেহারা এরকম হয়েছে কেন? আপনার শরীর খারাপ নাকি?

মানবেন্দ্র স্পষ্ট ধীর গলায় বললেন, আমি এইমাত্র নোবেল প্রাইজ পেয়েছি।

ঝরনার জলের মতো শব্দ করে হাসল মানসী। বড় পরিচ্ছন্ন সরলতা রয়েছে তার মধ্যে। এবং মানসীর চোখে সবসময়েই একটা বিস্ময়ের ভাব। অর্থাৎ এ পৃথিবীর কিছুই পুরনো হয়ে যায়নি তার কাছে।

হাসিটা অসম্পূর্ণ রেখে সে বলল, এত সামান্যতেই খুশি হন আপনারা?

মানবেন্দ্র ধমক দিয়ে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে বহুবচনে কথা বলবে না!

তার মানে? ও। প্রত্যেক লেখকই বুঝি আলাদা?

হ্যাঁ।

আমি কী করে জানব। আমি তো আর কারুকে দেখিনি।

তুমি ওই কথাটা আমাকে আর একবার বলো।

কোন কথাটা?

একটু আগে যেটা বললে।

আবার বলতে হবে কেন?

আমি শুনতে চাই।

মানসী একটু ভেবে নিয়ে বলল, এত সামান্যতেই খুশি হন আপনি?

মানবেন্দ্র ডান হাতটা মানসীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দাও!

কী?

ওই সামান্যর চেয়ে যা বেশি।

আমি কী দেব আপনাকে?

ওই সামান্যর চেয়ে যা বেশি। তুমি পারো।

আমি আপনাদের কথা বুঝতে পারি না।

আবার আপনাদের!

আমি আপনার কথা বুঝতে পারিনা।

ওসব শুনতে চাইনা, তুমি আমাকে দাও।

মানসী এবার একটা উদাসীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জানি না, আপনাকে দেবার মতো আমার কী আছে। আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, অনেক মেয়ের সঙ্গেও আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। আমি এমনিই একটি সাধারণ মেয়ে, আপনাকে আমি কী দিতে পারি?

মানবেন্দ্র একবার চোখ তুলে সন্ধ্যা আবছা হয়ে আসা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, আঃ আমি একে কী ভাবে বোঝাব। সেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। ভাষা কত দীন! আমি এই দীন ভাষারও সবটুকু জানি না।

মানসী বলল, চলুন, এবার যেতে হবে। ওরা ভাবছে।

মানবেন্দ্রর মুখখানা আক্রমণোদ্যত সিংহের মতো হিংস্র হয়ে এল। তার ভেতরের পশুটা ফুঁসে উঠছে। তিনি এক্ষুনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এই রমণীর টুঁটি চেপে ধরবেন। অতি প্রিয় জিনিস হাতছাড়া হয়ে যাবার মুহূর্তে যেমন তাকে ধ্বংস করে দেবার ইচ্ছে জাগে।

মানসী কয়েক পা এগিয়ে গেল। মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, যাক না, কত দূরে যাবে, আমি ওকে ঠিক ধরব।

মানসী বড় পাথরটার গায়ে হাত রেখে বলল, আপনার সামনে এলেই আমার কীরকম যেন ভয় করে। কেন জানেন তো?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মানসী আবার বলল, আমাদের সবারই তো কিছু কিছু গোপন কথা আছে।

আপনার চোখ দেখলে মনে হয়, আপনি বুঝি সব বুঝে ফেলছেন। লেখকেরা এমন ভাবে মেয়েদের মনের কথা লিখে দেয়।

এটা একটা অন্য দিক। এর মধ্যে লুকোনো গল্পের ইঙ্গিত আছে। মানবেন্দ্র নিজের চিন্তা ভুলে গিয়ে এই ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গোপন কথা মানে কী? দুঃখ?

দুঃখ?

মানসী যেন দুঃখ কথাটা নিয়ে মনে মনে কয়েক বার খেলা করল, তারপর বলল, কী জানি।

হঠাৎ হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটাবার অত ক্ষমতা আছে মেয়েদের। মানসী পরক্ষণেই বলল, আপনার বাড়িতে আর কে কে আছে?

মানবেন্দ্র আকস্মিক প্রশ্নের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উত্তর দিলেন, ও কথা থাক। আমার কোনও অতীত নেই।

আপনি বুঝি ব্যক্তিগত কথা পছন্দ করেন না।

না, সেজন্য নয়। আমি যদি বলি, পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা, তাহলে কথাটা একটু বোকা বোকা শোনাবে। আসলে আমি একাই থাকি, আমি বিয়ে করব বলে তিনবার প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম, শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি।

আমি বাইরের লোকের সঙ্গে চট করে মিশতে পারি না। সেই জন্যই যদি কিছু উলটো-পালটা কথা বলে ফেলি– ।

দূর থেকে একটি বাচ্চার গলায় মা ডাক শোনা যাচ্ছে। মানবেন্দ্র বুঝতে পারলেন, আর সময় নেই। তিনি মানসীর খুব কাছে গিয়ে চট করে তার হাত চেপে ধরে বললেন, আমি তো তোমার অচেনা নই।

নিজের ঘরে আজই সকালে মানবেন্দ্র যখন মানসীর হাত ধরেছিলেন, তখন মানসী বিন্দুমাত্র বিকার দেখায়নি। কিন্তু এবার চট করে সরে গিয়ে দুঃখিত গলায় বলল, আপনি যে আমায় তুমি তুমি করে বলেন, এতে আমার খুব অস্বস্তি লাগে।

মানবেন্দ্রর এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে এবং তিনি বোঝেন যে, মাত্র দু-এক দিনের আলাপের পর কোনও মেয়ের, বিশেষত কোনও বিবাহিত নারীর হাত ছোঁয়া যায় না। স্পর্শ করার জন্য একটা অধিকার চাই। অন্তত লম্পট হিসেবে একটা অখ্যাতি থাকলেও চলে। তবু মানসী দ্বিতীয় বার এই কথা বলায় মানবেন্দ্র খুবই দুঃখিত বোধ করলেন। যুক্তি নেই, কোনও যুক্তি নেই এরকম দুঃখ পাওয়ার। তাহলেও বুকের মধ্যে গঙ্গার মতো একটা ঢেউ ওঠে। তিনি হাতজোড় করে সত্যিকারের নম্র ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, আচ্ছা বলবনা, আর কখনও বলবনা!

মানসীর মুখ থেকে দুঃখের ভাবটা মিলিয়ে গেল। আবার সে দুচোখে বিস্ময় এবং মুখে সরল হাসি ফুটিয়ে বলল, আপনাকে কিন্তু সত্যিই আমার অনেক দিনের চেনা মনে হয়। তাছাড়া, আপনি তো আমাকে তুমি বলতেই পারেন।

অর্থাৎ মানসী বলতে চাইছে, তুমি বলে সম্বোধন করলেই গায়ে হাত ছোঁয়ানো যায় না। বিশেষত এই নির্জনে।

মানবেন্দ্র সব বুঝতে পেরে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন।

মানসী আর দাঁড়াল না। তরতর করে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি চললাম, আপনি আসবেন তো আসুন।

মানবেন্দ্র বললেন, আমি এখন যাবনা! তিনি বড় পাথরটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। ওদের সঙ্গে এসেছেন যখন আজ ওদের সঙ্গেই ফেরা উচিত, একথা মানবেন্দ্র ভালভাবেই জানেন। তবু তিনি গেলেন না। জ্ঞানপাপী কিনা।

মানবেন্দ্র পাথরটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোত বললেন, পাথর, কলক্ষ বছর ঘুমিয়ে আছ? এবার জাগো। এইমাত্র মানসী তোমাকে ছুঁয়েছিল, তুমি টের পেলে না? তোমাকে আমি অহল্যা বলতে চাই না। তোমাকে দেখে পুরুষ মনে হয়। মাটি স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারে, কিন্তু পাথর পুরুষ। কেমন লাগল মানসীর স্পর্শ? তুমি দেখলে তো, ও আমাকে অবহেলা করে চলে গেল।

মানবেন্দ্র আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ এখনও প্রত্যক্ষ, কিন্তু তরুণ শালবনের ওপর ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসছে। দূরের আকাশে এখনও খানিকটা এলোমেলো লাল রঙ ঠিক যেন রুয়োর একটি অসমাপ্ত ছবি।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে মানবেন্দ্র দেখলেন, অপস্রিয়মাণ শালবন, দেখলেন ঝরনার জলের অন্য রকম রং, দেখলেন পাথরের চাঙড়ের গম্ভীর অবস্থান, দেখলেন শেষ সন্ধ্যা ও আসন্ন রাত্রিকে। কিন্তু সব কিছুর চেয়ে বেশি সুন্দর একটি নারী। যে এই মাত্র ছিল, এখন নেই। পৃথিবীতে এর চেয়ে অনেক বেশি রূপসী নারী আছে, অনেক, কিন্তু মানবেন্দ্র এর গোপন সৌন্দর্য দেখছেন। যৌবনের মাঝামাঝি এসেও এই নারীকে দেখে তার হাত কাঁপে, বুকের মধ্যে টিপ টিপ শব্দ হয়। এই রূপের প্রচণ্ড ঝাপটায় তার মন অবশ হয়ে আসছে।

মানবেন্দ্র বললেন, হে আকাশ, হে বিশ্বপ্রকৃতি, হে বালুকণা, হে দারিদ্র, হে সামাজিক বৈষম্য, হে রাজনীতি, হে বিশ্বশান্তি, তোমাদের চেয়েও একটি নারীর রূপ আমার কাছে বেশি জরুরি মনে হচ্ছে এখন। আমাকে দোষ দিয়ো না। আমি এই নারীর রূপের পূজা

করতে চাই। এই নারী বিবাহিতা, তবু, হে সমাজ, আমাকে শাস্তি দিয়ো না। আমি তো একে কেড়ে নিচ্ছি না। ফুলের গন্ধ শুকলে কি বাগানের মালিকের কোনও ক্ষতি হয়? তাছাড়া আমি পাগল-ছাগল লোক, আমার কথা বাদ দাও! আমার কি কারওর কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে!

মি. মজুমদার, আপনি যাবেন না?

পাথরটার ওপরে এসে দাঁড়িয়ে অসীম বলছে এই কথা।

মানবেন্দ্র ওপরের দিকে তাকালেন।

এই পরিবেশে মি. মজুমদার বলে সম্বোধন করে অসীম একটু ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু মানবেন্দ্র তাতে একটুও বিরক্ত হলেন না। তিনি অসীমকে খুবই পছন্দ করে ফেলেছেন। অসীম এবং গৌতম এরা দুজনেই ভারি চমৎকার মানুষ। ভাল চাকরির মোহে অসীমের বাবা-মা ওকে আগাগোড়া সাহেবি স্কুলের শিক্ষা দিয়েছেন, তাই ও মাতৃভাষাটা ভাল শেখেনি এবং দেশীয় সহবৎ ভাল জানে না, কিন্তু সেজন্য ওর চরিত্র মলিন হয়নি। যে-কোনও নিপীড়িত শ্রমিকের চেয়ে অসীমের কম সমবেদনা পাবার কোনও যুক্তি নেই।

মানবেন্দ্র হাসিমুখে বললেন, আপনারা যান। আমার তো কোনও কাজ নেই। আমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে আর কী করব! আমি আর একটু থাকি!

অসীম বলল, জায়গাটা সত্যি খুব ভাল। আমরা আর একটু থাকতাম, কিন্তু বাচ্চারা যে বড্ড জ্বালাতন করছে। তাছাড়া ওদের আবার খাওয়া-দাওয়া আছে।

সে তো বটেই। আপনারা এগিয়ে যান, আমি একটু বাদেই আসছি।

রাস্তা চিনতে পারবেন তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এ আর কী!

অসীম চলে যাবার পর মানবেন্দ্র কান পেতে রইলেন। বনপথে তিনি শুনতে লাগলেন পদশব্দ। তিনি পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে। যেন একজন পলাতক। আস্তে আস্তে সেই শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

মানবেন্দ্র আবার চোখ তুললেন। তিনি দেখলেন, আকাশ শালবন, ঝরনা, পাথর-কিছুই আর সুন্দর নয়। সব জায়গায় কালি, শুধুকালি। হঠাৎ যেন ঘোর অন্ধকার নেনে এসেছে!

মানবেন্দ্র বুঝতে পারলেন, মানসী তার পাগলামি সারাবার জন্য আসেনি। মানসী এসেছে তাকে আরও বেশি পাগল করতে।

.

০৬.

নিজের ঘরে ফিরে এসে মানবেন্দ্র ষড়যন্ত্র করতে বসলেন। এই মেয়েটিকে তার চাই। যে-কোনও উপায়ে পেতেই হবে।

তার আগে দেখতে হবে মেয়েটি আসলে কে। এক জন বিবাহিতা নারী, যার রূপের একটা আকর্ষণ আছে, কিন্তু আহামরি কিছু না। তার ব্যবহারের মধ্যে আছে একটা খেয়ালিপনা, সেটাই বেশি আকর্ষণীয়। আজ সন্ধেবেলাতেই মানবেন্দ্র জানতে পেরেছেন যে তিনটি বাচ্চার মধ্যে মানসীরই দুটি। দুটি সন্তানের জননী হয়েও এ-রকম আকর্ষণীয় থাকা কোনও নারীর পক্ষে যথেষ্ট কৃতিত্ব নিশ্চয়ই। সে কিছুটা সাহিত্য পড়েছে, ঠিক সময় মানবেন্দ্ররই কবিতার লাইন উচ্চারণ করে অভিভূত করে দিয়েছে এই পাগল লেখককে। কিন্তু সেই জন্যই কি এত টান? না, এর চেয়ে বেশি কিছু আছে।

মানসীকে পেতেই হবে। কিন্তু তার স্বামী আছে। অসীম চমৎকার মানুষ। তার মনে দুঃখ দেওয়া সম্ভব নয়। দরকার হলে মানবেন্দ্র অসীমের কাছ থেকে মানসীকে একটুখানি চেয়ে নেবেনে। তিনি বলবেন, অসীম, তোমার স্ত্রীকে নিশ্চিন্তে আমার কাছে দাও।

অসামান্যা নারীদের কোনও কিছুই ক্ষয় হয় না, ব্রহ্মা কিংবা অমৃতের মতো তারা উচ্ছিষ্ট হয় না। যখন তুমি ফিরে পাবে, তখন সম্পূর্ণই পাবে। ওকে পেলে আমি ধন্য হবো কিন্তু তুমি একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

কী করে পাওয়া যায় মানসীকে? এর আগে মানবেন্দ্র যে-সব রমণীদের চেয়েছেন, তাদের পাবার একমাত্র উপায় ছিল প্রতীক্ষা। ঠিকমতো আহ্বান জানালে প্রতীক্ষার পর ঠিকই পাওয়া যায়। উনিশ কুড়ি বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বকুল গাছের নিচে তিনি প্রতীক্ষা করতেন সুনন্দার জন্য। একদিন, দুদিন, তিন দিন সুনন্দা আসেনি। তিনি তখন ঠিক করেছিলেন, সুনন্দা যদি সত্যিই না আসে, তাহলে তিনি কলেজের লাইব্রেরিতে আগুন ধরিয়ে দেবেন। অন্যান্য প্রতিশোধের চেয়ে লাইব্রেরিতে আগুন ধরানোর ব্যাপারটাই তার বেশি মনঃপূত হয়েছিল। তখন মনীষা ভয় পেয়ে সুনন্দাকে পাঠিয়েছিল তার কাছে। সুনন্দাকে সাড়ে তিনশো চুম্বনের পর মানবেন্দ্র ভেবেছিলেন, সুনন্দাকে পাবার জন্য আমি শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, টয়েনবি, হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রভৃতির কাছেও ঋণী। এবং বকুল গাছটারকাছেও কিছুটা ঋণী।

কিন্তু মানসীকে পাবার জন্য তো প্রতীক্ষার সময় নেই। ওরা কাল সকালেই চলে যাবে। এক্ষুনি একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। মানবেন্দ্রর মুখখানা খাঁটি ষড়যন্ত্রকারীর মতো হয়ে এল।

তিনি ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগলেন। বুদ্ধিতে একটু শান দেওয়া দরকার। তিনি পকেট থেকে এক গাদা খুচরো পয়সা বার করে ছড়িয়ে ফেললেন মেঝেতে। তারপর বেল বাজিয়ে ডাকলেন বেয়ারাকে।

রামচন্দ্রন আসতেই তিনি ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, ঘরটা ভাল করে পরিষ্কার করো না? এক্ষুনি সাফা করে দাও।

রামচন্দ্রন একটা লম্বা বুরুশ এনে ভেতরে এসে বলল, সাব, বহুত পয়সা গিরা যায়।

মানবেন্দ্র জানলার কাছে একটা বই খুলে দাঁড়িয়ে অবহেলার সঙ্গে বললেন, সাফা করা, সব সাফা করো।

ঘর পরিষ্কার করার পরেও রামচন্দ্রন প্রায় দু-তিন টাকার মতো খুচরো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানবেন্দ্র আবার তাকে ধমক দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও।

এ-রকম ধমকেও খুশি হয় না এমন পরিচারক ভূ-ভারতে নেই। সে হাসিমুখে সেলাম করে চলে যাচ্ছিল, দরজার কাছে যেতেই মানবেন্দ্র তাকে বললেন, দাঁড়াও! পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, একটা জিনের পাঁইট নিয়ে এসো।

রামচন্দ্রন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার উপরে স্পষ্ট নির্দেশআ ছে, সে মানবেন্দ্রর জন্য কক্ষনও মদ কিনে দেবে না। তার মুখে ফুটে উঠল দারুণ দ্বিধা।

মানবেন্দ্র আবার হুকুমের সুরে বললেন, যাও!

জিনের শিশিটা আসবার পর মানবেন্দ্র ফেরত খুচরোটা সবটাই বকশিস দিলেন তাকে। তার বদলে সে লুকিয়ে এনে দিল অনেকগুলো লেবুর টুকরো ও বরফ। মানবেন্দ্র জিনের গেলাসে মস্ত বড় একটু চুমুক দিয়ে বললেন, আঃ!

তারপর ভাবলেন, পাগল যদি হতেই হয়, একটি মেয়ের জন্যই পুরোপুরি পাগল হওয়া ভাল।

আমি মানসীকে পুজো করব। তার পায়ের কাছে বসে বলব, তুমি এক জন সামান্য নারী, মনে কোনও অহঙ্কার এনো না। আমিও এক জন অতি সাধারণ মানুষ। আমার মধ্যে ঈর্ষা আছে, লোভ আছে, রাগ আছে। কিন্তু তোমাকে যখন দেখি, তখন তো আর কিছুই মনে পড়ে না। আমার হাত কাঁপে। আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে, আমার চল্লিশ বছর বয়েসের কঠিন বুক। তোমাকে মনে হয় এই বিশ্বপ্রকৃতির চেয়েও বেশি সুন্দর। এই যে

মোহ, এর চেয়ে চমৎকার আর কিছু নেই। আমি এই মোহকে বন্দনা করি। তুমি দেবী হও।

আমি তোমাকে শুধু পুজো করব না, আমি আদরও করব। আমি তোমার ওষ্ঠ থেকে নেব সেই সবটুকু, নারীর ওষ্ঠ যতখানি দিতে পারে। আমার জিভ তোমার জিভের সঙ্গে খেলা করবে। আমি শিশুর মতো তোমার স্তনে দাঁত ছোঁয়াব। আমি তোমার উরুতে চেপে ধরব আমার মুখ। আমি দুর্দান্ত পাগল হয়ে উঠব। আমার পুজো এই রকম। আমি নির্লোভ হতে পারি না। শরীর না ছুঁয়ে আমি নারীর কোনও ভাষাই বুঝতে পারি না।

আমি তোমাকে লোভ করেছি। কিন্তু তোমাকে পেলেই আমার লোভ চলে যায়, তখন পূজা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ লোভ আমাকে মহত্ত্বের রাস্তা দেখায়।

তোমার কাছ থেকে আমি পাব। সাম্রাজ্যের চেয়েও ঢের বেশি। কিন্তু এর বদলে আমি কিছু দিতে পারব না। কাগজ-কলমে অক্ষরের সারি সাজানো ছাড়া আমার আর কিছু দেবার সাধ্য নেই। শুধু, কখনও কখনও হয়তো তোমার মনে পড়বে, একজন শুধু তোমাকে চায়নি, তোমাকে পুজো করেছিল। সেইটুকুর কি কোনওই দাম নেই?

এখানে, আমার খাটে, এই পবিত্র বেদিতে, মানসী, আমি তোমাকে পুজো করতে চাই। সময় বেশি নেই, মানসী, তুমি চলে এসো।

জিনের শিশিটা অর্ধেক মাত্র শেষ হয়েছে, এই সময দরজার বাইরে থেকে গৌতম বলল, আপনি কি ব্যস্ত আছেন? আসতে পারি?

মানবেন্দ্র বসে আছেন চেয়ারে। টেবিলের ওপর মদের গ্লাস। অন্য কারুকে দেখে গ্লাস লুকোবার অভ্যেস তার নেই। তিনি বললেন, আসুন!

গৌতম ঘরের মধ্যে এসে কোথায় বসবে ভাবছে, মানবেন্দ্র তাকে খাটটা দেখিয়ে দিলেন। অন্য আর একটি মাত্র চেয়ার ছিল, সেটাতে বইপত্র স্তূপাকার।

মানবেন্দ্র বললেন, আমি একটু জিন খাচ্ছি। আপনার চলবে?

গৌতম একটু চিন্তা করে বলল, আচ্ছা, অল্প একটু

সে ভাবছিল, মানবেন্দ্রর কাছে বেশি নেই, এর থেকে সে ভাগ বসাবে কি না। কিন্তু সে কথাটা উচ্চারণ করা ঠিক ভদ্রতা নয়। নিজেই সে গেলাস-টেলাস এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করল।

আপনারা তো কালই চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। ভোরেই বেরিয়ে পড়ব।

এরপর কোথায়?

আমার কাজের জায়গায়। ছুটি বেশি নেই। আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। নর্থ বেঙ্গলে, আমি একটা চা বাগানে কাজ করি, আমি ওখানকার ম্যানেজার।

বাঃ, আমি কখনও কোনও চা বাগানের ম্যানেজারকে স্বচক্ষে দেখিনি। আগে তো সাহেবরাই হত।

হ্যাঁ, মানে, বাগানটা আগে আমাদের পরিবারের ছিল, বিক্রি হয়ে গেছে, এখন আমি ওখানে কাজ করি। আমি বলছিলাম, আমাদের বাংলোতে অনেক জায়গা আছে, আপনি তো এখানে বিশ্রামের জন্য এসেছেন। যদি আমাদের সঙ্গে ওখানে যান, তাহলে আপনার খুব ভাল লাগবে। আমাদেরও খুব ভাল লাগবে।

আপনাদের সঙ্গে?

অসীমরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। হিরন্ময় এখান থেকেই ফিরতে চাইছে, আমরা ওকে আটকাবার চেষ্টা করছি অবশ্য। গাড়িতে জায়গার অসুবিধে নেই, আপনার একটু কষ্ট হবে হয়তো।

এত লোভনীয় প্রস্তাব যে, মানবেন্দ্রর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার কথা ছিল। একেই তো বলে সুবর্ণ সুযোগ। তিনি মানসীকে কাছাকাছি পাবেন আরও কয়েকদিন। প্রতীক্ষা আরও বিস্তারিত হতে পারবে।

কিন্তু মানবেন্দ্রর ভেতরে থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, না। বড় দীর্ঘ সেই না, প্রতিধ্বনি তুলে গুমরোতে লাগল বুকের মধ্যে। হঠাৎ এইভাবে কেউ নেমন্তন্ন করলে তিনি তো কখনও কোথাও যাননি। অচেনা কারুর আতিথ্য গ্রহণ করতে তার অত্যন্ত অস্বস্তি হয়। এখন, এমনকী মানসীর কথা ভেবেও তিনি রাজি হতে পারছেন না।

মানবেন্দ্র যদি ঠিক এই রকম একটি গল্প লিখতেন, অর্থাৎ নিজেই হতেন একটি গল্পের চরিত্র, তাহলে এই রকম জায়গায় ঠিক এই রকম কোনও ঘটনা ঘটত না। কেউ এসে তাকে অনুরোধ করত না চা-বাগানে আতিথ্য নেবার জন্য।

বাস্তবে অনেক উদ্ভট ব্যাপার ঘটে। এক নজর দেখেই একটি ছেলে বা মেয়ে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু গল্পের মধ্যে এর জন্য অনেক প্রস্তুতির দরকার হয়। এখানে বাস্তবের এই উদ্ভট পরিস্থিতিকে মানবেন্দ্র যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করলেন।

তিনি বললেন, আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলে তো খুবই ভাল লাগত, কিন্তু আমি এখানে বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকব বলেই এসেছি।

গৌতম বলল, আমাদের ওখানেও কিন্তু আপনার বিশ্রামের কোনও ব্যাঘাত হবে না। আপনি গেলেই বুঝতে পারতেন, খুব শান্ত জায়গা, আপনার থাকার জায়গা একদম আলাদা হবে। যদি ইচ্ছে মতে বেড়াতে চান, জিপ গাড়ি আছে।

মানবেন্দ্রর ঠোঁটের পাশে একটা চাপা হাসি দেখা দিল। এরা আমাকে এত খাতির করছে কেন? এরা কি জানে, আমার মনের মধ্যে একটা শয়তান লুকিয়ে আছে? আমি স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করিনি। আমি যদি তোমাদের সংসারে অশান্তি এনে দিই?

মানবেন্দ্র বললেন, আচ্ছা, জানা রইল, পরে কোনও এক সময়- ।

কেন, এখনই চলুন না।

মানবেন্দ্রর ইচ্ছে হল, গর্জন করে বলে ওঠেন, তুমি জানো, আমি পাগল! আমি কখন কী করে ফেলব তার ঠিক নেই। আমি উপযুক্ত নই তোমাদের সমাজের। আমি পতিত।

তার বদলে তিনি দুবার ঘাড় হেলিয়ে বললেন, না, থাক।

গেলে কিন্তু আপনার ভাল লাগত। আমাদেরও খুব ভাল লাগত। আপনার সঙ্গে দেখা হল, অথচ ভাল করে গল্প করা হল না। পাঠকদের তো অনেক কৌতূহল থাকে লেখকদের সম্পর্কে।

আবার বহুবচন।

মানবেন্দ্র বললেন, আমাকে যারা চেনেনা, আমি তাদের সঙ্গে মিশতেই ভালবাসি। বেশি লোকজনের মধ্যে আমি কীরকম যেন গুটিয়ে যাই।

অনুরাধা আপনার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী।

সুন্দরী মেয়েদের সংস্পর্শ আমার খুবই ভাল লাগে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, তাদের প্রত্যেকেরই আগে থেকে স্বামী কিংবা প্রেমিক আছে।

গৌতম হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, লেখকরা বুঝি প্রেমিক বা স্বামী হয় না? তারা অন্য কিছু হয়?

মানবেন্দ্র এক চুমুকে নিজের গেলাসটা শেষ করে চুপচাপ বসে রইলেন। বোতলটাও শূন্য।

গৌতম বলল, আমি এক্ষুনি আসছি।

অবিলম্বে সে ফিরে এল আর একটা জিনের বোতল হাতে নিয়ে। বিনীত ভাবে বলল, আমার কাছে সামান্য কিছু ছিল।

অসম্ভব ভদ্র ও বিনীত এই যুবকটি। চা-বাগানের কুলিকামিন বা অফিসের কেরানিদের সঙ্গেও কি সে ঠিক এই রকম ব্যবহার করে? নাকি তখন অন্য একটা মুখোশ পরে নেয়? মানবেন্দ্রকে যদি ও লেখক হিসেবে না চিনত, তাহলে কীরকম ব্যবহার হত ওর? চা বাগানের ম্যানেজারের বই-টই পড়ার সময় হয় কী করে? ও, বুঝেছি, ওর নিজেরই তো এক সময় লেখার বাতিক ছিল।

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজে এখন আর কিছু লেখেন না?

আগের দিনের মতো গৌতম এখন আর তেমন লজ্জা পেল না। নতুন গেলাসে চুমুক দিয়ে সে পরিষ্কার ভাবে বলল, লেখক হবার সাধ্য আমার নেই, এটা আমি জেনে গেছি। এক সময় শখ ছিল। তবে, এখনও আমি লিখি, একটাই গল্প, বার বার লিখি, প্রতি বছর নতুন করে লিখে যাই। কোনও দিন সেটা ছাপা হবে না, কেউ সেটা পড়বে না, মানে আমি কারুকে পড়াতেও চাইনা–

তবে লেখেন কেন?

নিজের আনন্দের জন্য!

মানবেন্দ্র ভাবলেন, বাঃ, এটা বেশ একটা শাশ্বত উত্তর। মানুষ লেখে কেন? আনন্দের জন্য। কিন্তু সবসময় এটা ঠিক নয়। ডস্টয়েভস্কি অনেকগুলো লিখেছেন শুধু পয়সার জন্য। কেউ লেখে আদর্শবাদ প্রচারের জন্য। অনেক সময় একদম লিখতে ইচ্ছে করে না, তবু লিখতে হয়। তিনি প্রথম যৌবনে লিখতে শুরু করেছিলেন শুধু অন্য কয়েকজনকে বোঝাবার জন্য, দ্যাখ, আমিও লিখতে পারি। এটা কি আনন্দ না আত্মশ্লাঘা?

বাঃ, আমাদের বাদ দিয়ে?

দরজার কাছ থেকে গৌতমকে এই কথা বলল হিরন্ময়। সঙ্গে অসীমও এসেছে।

মানবেন্দ্র বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

ওরা দুজনে খাটে এসে বসল। অসীম বলল, উঃ, কী দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে একেবারে।

হিরন্ময় গৌতমকে জিজ্ঞেস করল, কী খাচ্ছিস রে? জিন? এই ঠাণ্ডায় ব্র্যান্ডি হলে জমত।

গৌতম বলল, ব্রান্ডি আছে তো, নিয়ে আয়। অসীম, তোর ঘরেই তো আছে।

অসীম উঠে গেল আনতে।

হিরন্ময় বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমরা একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে খাচ্ছিলাম, যদি আপনি কিছু মনে করেন। আমি অবশ্য ওদের বলেছিলাম, অনেক রাইটারই ড্রিঙ্ক করে। কী, ঠিক বলিনি? রবীন্দ্রনাথ ড্রিঙ্ক করতেন না?

মানবেন্দ্র বললেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

গৌতম বলল, রবীন্দ্রনাথ কক্ষনও ড্রিঙ্ক করেননি।

হিরন্ময় বলল, তুই কী করে জানলি? অতবড় জমিদার ফ্যামিলি –।

রবীন্দ্রনাথ সব ব্যাপারেই আলাদা ছিলেন।

তোরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করিস। ড্রিংক করলেই বা দোষের কী আছে! সব লেখককেই ড্রিঙ্ক করতে হয়, কিংবা কোনও একটা নেশা, ওদের নার্ভকে রিলাক্স করাবার জন্য।

হিরন্ময় হঠাৎ নিজের কথা থামিয়ে মানবেন্দ্রকে সাক্ষ্য মেনে জিজ্ঞেস করল, আপনি বলুন না, রবীন্দ্রনাথ ড্রিংক করতেন না? শরৎবাবু ড্রিংক করতেন না?

মানবেন্দ্র বললেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেরকম কিছু জানা যায় না। ওঁর বাড়ির প্রাইভেট টিউটর লরেন্সকে উনি নিজের বাড়ি থেকে এক বোতল মদ পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে কখনও খেতেন কি না তার উল্লেখ নেই। তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র খেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার নৈহাটির বাড়িতে মাঝে মাঝে মদের আসর বসাতেন, যেখানে আসতেন নবীন সেন ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রও দিশি মদ খেতে ভালবাসতেন। তার পরের আমলেও অনেকে যদিও খেতেন-টেতেন, কিন্তু লেখার মধ্যে সেটা গোপন করে গেছেন, মানিকবাবু ছাড়া।

আবার আমি এমন অনেক লেখককে জানি, যাঁরা এ জিনিস কখনও স্পর্শ করেন না। তাতে কিছু যায় আসে না। লেখার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কই নেই। লেখকরাও তো অনেকটা মানুষের মতোই এক ধরনের প্রাণী। মানুষ যেমন নানা রকম হয়, লেখকরাও সে-রকম হতে পারে।

গৌতম বলল, তবু আমার মনে হয়, লেখক-শিল্পীরা ঠিক সামাজিক মানুষের মতো হতে পারে না। এমন একটা কাজে তারা নিজেদের জীবনীশক্তি ব্যয় করে, যার বিনিময়ে কী পাবে তারা জানেনা। তাছাড়া লেখার সময় অত্যন্ত বেশি মনঃসংযোগ করতে হয় বলেই অন্য সময় তাদের মনটা খুব ছটফটে থাকে, নিয়মকানুনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। কি, আমি ঠিক বলছি?

মানবেন্দ্র অন্য মনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন, কী জানি!

হিরন্ময় বলল, আচ্ছা, আজকালকার অন্য সব লেখকের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

মুখ চেনা আছে।

লেখকদের মধ্যে আপনার বন্ধু কেউ নেই?

এক সময় ছিল।

লেখকদের কাছে আমাদের একটা প্রশ্ন আছে। দেশের এই যে অবস্থা, কিছু শকুন দেশের অধিকাংশ মানুষকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, চারদিকে শুধু কালোবাজার আর কালো টাকার খেলা, মানে আমি বলতে চাইছি, দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, একটা টোটাল অরাজকতা। এই সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন না? আপনারা যদি চাবুক মেরে জাগিয়ে তোলেন এই পচা-গলা সমাজটাকে, কিন্তু তার বদলে আপনার শুধু প্রেমের গল্প লেখেন কিংবা অ্যাডভেঞ্চার।

মানবেন্দ্র দুঃখিত ভাবে তাকালেন হিরন্ময়ের দিকে। এই সব কথা যদি একটা স্কুলে বা কলেজের ছেলে বলত, তাহলে মানাত। অল্প বয়সে আদর্শবাদটা আন্তরিক থাকে, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে সত্যিই কষ্ট হয়। কিন্তু সাহেবি কোম্পানিতে ভাল চাকরি করে যে-লোক, ডাকবাংলোয় বসে মদের গেলাস হাতে নিয়ে তার মুখে এই সব কথা যে অত্যন্ত অশ্লীল শোনায়, সে জ্ঞান এর নেই। অধিকাংশ মানুষেরই ঔচিত্যবোধ থাকে না। সাধে কী আর এর নাম ভিলেজ ইডিয়ট দিয়েছিলেন।

মানবেন্দ্র হাত জোড় করে বললেন, এই দেশের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাবার কাজে আমি কিছুই করতে পারিনি, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

মানবেন্দ্রর কণ্ঠস্বর এমন তীব্র যে হিরন্ময় একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, না না, আপনি ক্ষমা চাইছেন কেন? আমি সেভাবে বলিনি।

আপনি একটা অভিযোগ করেছেন, সেই জন্যই আমি ক্ষমা চাইছি। আমি পারিনি, কী করব বলুন। এ-জন্য আমাকে যদি কিছু শাস্তি পেতে হয়–

হিরন্ময় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, গৌতম তাকে বাধা দিয়ে বলল, লেখকদের কাছ থেকে এ রকম দাবি করা যায় কি না, সে সম্পর্কে কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। কোনও কোনও লেখক বা কোনও কোনও বই সমাজ পরিবর্তনে কিছু সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের কাছ থেকে আমরা আনন্দই পেতে চাই। শুধু বড় বড় সামাজিক আদর্শের

কথা মনে রেখে যেগুলো লেখা হয়, সেগুলো বেশির ভাগই অপাঠ্য। সেগুলো শিল্পও হয় না, আবার তা দিয়ে সমাজের উপকারও হয় না।

হিরন্ময় বলল, অধিকাংশ মানুষের জীবনেই যদি কোনও আনন্দ না থাকে, তাহলে আর্ট থেকে আনন্দ পাবে কী করে?

তা-ও পেতে পারে।

তুই বলতে চাস, লোকে যখন খেতে পাচ্ছে না-   ।

তখন সে বইও পড়বে না। কোনও বই-ই মানুষকে খেতে দিতে পারবে না।

পৃথিবীতে এমন অনেক বই লেখা হয়েছে, যা দিয়ে

বই আর সাহিত্য এক নয়। যেমন রাইটার্স বিল্ডিং কথাটার মানে সাহিত্যিকদের বাড়ি নয়। যে কোনও লেখা আর সাহিত্য এ দুটো আলাদা ব্যাপার কথা হচ্ছে, আমরা যাকে সাহিত্য বলি, তার কাছ থেকে কী আশা করি? আমার সোজা কথা, যে-বই পড়ে আমি আনন্দ পাবনা, সে বই আমি পড়তে চাইব না। জোর করে কি কারুকে বই পড়ানো যায়?

মানবেন্দ্রর সর্বাঙ্গে যেন অজস্র সঁচ ফুটছে। জীবনে অন্তত হাজার বার তিনি এই ধরনের তর্ক বা আলোচনার মধ্যে পড়েছেন। তিনি জানেন, এর কোনও মীমাংসা নেই। এখানেও তিনি এই আলোচনা একটুও চান না, এখানে তিনি নির্জন মনকে শান্ত করার জন্য এসেছিলেন।

অসীম আগাগোড়া চুপচাপ বসে আছে। সে বই-টই বিশেষ পড়ে না। সে বুদ্ধিমান বলেই, যে সম্পর্কে জানে না, সে-সম্পর্কে কথাও বলতে চায় না।

অসীম তার বন্ধুদের বলল, তোরাই তো শুধু কথা বলছিস, ওনাকে কিছু বলতে দে।

মানবেন্দ্র অসীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, না না, ঠিক আছে। সাহিত্য কীরকম হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে সাহিত্যিকরা কিছু জানে না, অন্যরাই ভাল জানে।

গৌতমের তর্কের নেশা লেগে গেছে, সে গলা চড়িয়ে হিরন্ময়কে বলল, ওসব বাজে কথা রাখ। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি–ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে–এই লাইনটার অন্য আর কী মূল্য আছে। এরকম লাইন মানুষের দুঃখ-দারিদ্র ঘোচায় না, কিন্তু শুনলেই মনের মধ্যে যে একটা অদ্ভুত ভাব জেগে ওঠে, সেটাই এর আসল মূল্য।

গৌতম তার উৎসাহিত উজ্জ্বল মুখখানা ঘোরাল মানবেন্দ্রর দিকে।

মানবেন্দ্র বললেন, স্বীকার করতেই হবে। চা-বাগানের ম্যানেজার হিসেবে আপনি এক্সেপশনাল।

গৌতম লজ্জা পেয়ে গেল এ কথায়। মিনিট খানেক চুপ করে রইল সবাই। এক-এক সময় হয় এ-রকম, যখন ঘরের সবাই হঠাৎ একসঙ্গে চুপ করে যায়, শুধু শোনা যায় ঘড়ির টিকটিক শব্দ।

সে নিস্তব্ধতা ভাঙার আগেই এসে পড়ল অনুরাধা। সে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, বাঃ, তোমরা এখানে আড্ডা জমিয়ে বসেছ, আমাদের ডাকোনি যে?

অসীম বলল, তোমরা তো বাচ্চাদের ঘুম পাড়াচ্ছিলে।

বেড়াতে এসেও আমরাই বাচ্চাদের সামলাব, আর তোমরা আড্ডা মারবে!

ঠিক আছে, এবার তোমরা আড্ডায় বসো, আমরা বাচ্চাদের দেখতে যাচ্ছি।

বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

মানসী কোথায়?

কী জানি, বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল কিনা!

মানবেন্দ্র অনুরাধাকে বললেন, আপনি ভেতরে আসুন।

অনুরাধা ঘরে ঢুকে চারদিকটা একবার দেখে নিল। তারপর বলল, আপনার ঘরটায় ব্যাচিলার ব্যাচিলার গন্ধ।

মেয়েদের ঘ্রাণশক্তি বিখ্যাত। কোনও কোনও নারীর আরও বেশি থাকে। মানবেন্দ্র তাকালেন অনুরাধার দিকে। তীক্ষ্ণনাসা নারী। ভুরু দুটো আরও সুদৃশ্য। মানবেন্দ্র লক্ষ্য করলেন, তারহাত কাঁপছে না, বুকের মধ্যেও ঢিপ ঢিপ করছেনা। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

গৌতম বলল, আমি মানসীকে ডেকে আনি। ও বেচারা একা একা রয়েছে।

অনুরাধা বিচিত্র ভাবে তাকাল স্বামীর দিকে। কিন্তু গৌতমের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল না। গৌতম বেরিয়ে গেল।

অনুরাধা বিছানায় বসতে দ্বিধা করছে বোধহয়। অনাত্মীয় পুরুষের বিছানায় মেয়েরা সহজে বসে না, এ ব্যাপারে তাদের একটা কুসংস্কার আছে।

মানবেন্দ্র তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি এখানে বসুন।

অনুরাধা সেখানে বসে বলল, আপনি ওদের অনেক গল্প শোনালেন বুঝি? আমাকে একটা বলুন।

আমি নিজেই ওদের গল্প শুনছিলাম।

ওদের আবার গল্প কী?

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই তো একটা করে গল্প থাকে?

থাকে বুঝি? আমার গল্পটা কী বলুন তো?

আমি তো জ্যোতিষী নই। আপনিই বলুন।

আমারও একটা গল্প আছে ঠিকই, কিন্তু আমি তো সাহিত্যিক নই, কী করে বলতে হয় জানি না।

মুখে মুখে গল্প বলার জন্য সাহিত্যিক হওয়ার দরকার হয় না। আপনি বলুন। আমরা উদগ্রীব।

শুনবেন? একটি মেয়ের যখন চোদ্দো বছর বয়েস, তখন সে একসঙ্গে দুটি ছেলের প্রেমে পড়ে। এক জন তার মাসতুতো ভাইয়ের বন্ধু আর এক জন বাবার বন্ধুর ছেলে। দুজনেই খুব হ্যান্ডসাম। দুজনেই লেখাপড়ায় ভাল। মেয়েটি যখন উনিশ বছর বয়েস হল, তখন প্রশ্ন জাগল যে, এই দুজনের মধ্যে কাকে সে বিয়ে করবে। দুজনের এক জনকে বেছে নেওয়া খুবই শক্ত। একটি মেয়ে তো এক সঙ্গে দুজনকেই বিয়ে করতে পারে না।

কথা বলতে বলতে অনুরাধা বার বার তাকাচ্ছে দরজার দিকে। পা দুটো দোলাচ্ছে। তার মুখে একটু যেন বেশি উত্তেজনা। গল্পের মাঝখানে বাধা দিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, একসঙ্গে দুজনকে বিয়ে করার ব্যাপারটাও কিন্তু মন্দ না। আবার চালু করে দিলেই হয়!

অনুরাধা বলল, সে যাই হোক, এই মেয়েটির বেলায় তো আর তা হয়নি! এক জনকেই বিয়ে করতে হল। এবং বিয়ের পরদিন সে বুঝতে পারল, ভুল করেছে। অন্য ছেলেটিকে পেলেই সে সুখী হতে পারত।

অসীম বলল, মেয়েটি যদি প্রথম ছেলেটির বদলে দ্বিতীয় ছেলেটিকে বিয়ে করত, তাহলেও হয়তো তার ওই একই কথা মনে হত। এ-রকম হয়।

অনুরাধা বলল, মোটেইনা। মানুষ শুধু এক জনকেই ভালবাসতে পারে, দুজনকে না!

মানবেন্দ্র বললেন, আমি জ্যোতিষী নই। কিন্তু আমি এটুকু অন্তত বুঝতে পারি, এটা আপনার জীবনের গল্প নয়।

অসীম বলল, এ দুজন ছেলের মধ্যে এক জন রয়ে গেল প্রেমিক, আর একজন স্বামী। স্বামীদের তুলনায় প্রেমিকরা সব সময়েই জিতে যায়। তাই না! কী রে হিরন্ময়, তুই কী বলিস।

আমি কী করে জানব?

তুই তো স্বামী হোসনি এখনও।

অনুরাধা বলল, উনি তো প্রেমিকও হননি।

হিরন্ময় অবাক হবার ভান করে বলল, সে কী? আমাকে এতই অযোগ্য মনে হয়?

আপনাকে দেখলেই কী-রকম যেন ভাই ভাই মনে হয়।

কী সাংঘাতিক কথা, আমার তাহলে কোনও চান্স নেই?

অনুরাধা মানবেন্দ্রর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি নিশ্চয়ই অনেক প্রেম করেছেন? মেয়েদের ভালভাবে না জানলে তাদের সম্পর্কে লিখবেন কী করে?

মানবেন্দ্র বললেন, আমি অনেক মেয়ের প্রেমে পড়লেও মেয়েরা কেউ আমার প্রেমে পড়েনি। ঘন্টায় ষাট মাইল স্পিডে গাড়ি যাচ্ছে, তার মধ্যে বসে থাকা একটি মেয়েকে এক পলকের জন্য দেখেই এত প্রেমে পড়েছিলাম তার যে, সাত দিন ভাল করে খেতে পারিনি।

আহা, মেয়েটা যদি জানতে পারত!

এই সময় গৌতম ফিরে আসতেই অনুরাধা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ভাগ্যিস তুমি ফিরতে দেরি করলে, তাই এর ফাঁকে আমি ওঁকে একটা গল্প শুনিয়ে দিলাম।

গৌতম বলল, দেরি করিনি তো। মানসী আসতে চাইল না। ও বলছে, ওর খুব খিদে পেয়েছে।

গেলাসে ব্রান্ডি ঢেলে গৌতম দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সেটা জল-টল না মিশিয়েই শেষ করল এক চুমুকে। তারপর তাকাল আবার এ-দিকে। তার মুখের চামড়ায় অতিরিক্ত রক্তের ঝলক।

অনুরাধার ঠোঁটে লুকোনো হাসি, সে স্বামীর দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। গৌতম বলল, শোনো, উনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হচ্ছেন না।

অনুরাধা মানবেন্দ্রকে বলল, আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে?

না।

কেন? চলুন না। অনেক গল্পের খোরাক পাবেন।

আমার এখানে কাজ এখনও বাকি আছে।

কাজ? আপনি কি এখানে কাজ করতে এসেছিলেন নাকি?

এখানে আকাশ আর বাতাসের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। এখনও সেটা শেষ হয়নি।

অনুরাধা নিচের ঠোঁটটা কামড়ে মধুর ভাবে তাকাল। মানবেন্দ্র একটু লজ্জা পেয়েছেন। তিনি একটু সাজিয়ে কথা বলছেন এদের সঙ্গে। এ-রকম আর্ট করে কথা বলা তার একদম স্বভাব নয়।

অনুরাধা বলল, দাঁড়ান, মানসীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।

অনুরাধা কী করে বুঝল, মানসীই একমাত্র জোর করে মানবেন্দ্রর ওপরে। কিংবা মানবেন্দ্র ওর কথা অবহেলা করতে পারবেন না।

মানবেন্দ্র বললেন, নেমন্তন্ন তো রইলই, অন্য কোনও সময় –

অসীম এমনিতেই কম কথা বলে। সে প্রায় চুপ করেই বসে ছিল। কিন্তু তার গ্লাসই ঘন ঘন শেষ হচ্ছে। মনে হয়, এদের মধ্যে তারই মদের নেশা বেশি। যদিও সে কোনও রকম মাতলামি করে না, উত্তেজনা দেখায় না। কিন্তু তার চোখ দুটি লালচে হয়ে এসেছে, মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া।

অনুরাধাই অসীমকে এক সময় ধমক দিয়ে বলল, এই, তুমি এত বেশি খাচ্ছ কেন?

অনুরাধা তার স্বামীর মদ্যপান সম্পর্কে তেমন আপত্তি না জানিয়ে বকছে অসীমকে। সাধারণত উলটোটাই হয়। তবে, গৌতম বোধহয় কখনও মাত্রা ছাড়ায় না, এবং তার স্ত্রী সেকথা জানে।

অসীম অনুরাধার বকুনি গ্রাহ্য না করে আবার গেলাসে ঢালল অনেকখানি। অনুরাধা কেড়ে নিল গেলাসটা। অসীম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও কী করছ, দাও! বেশ পা টলছে অসীমের।

মানবেন্দ্র ওদের দিকে সহাস্য মুখে তাকিয়ে রইলেন। সামান্য ব্যাপার, বাইরে বেড়াতে এসে এ রকম হয়ই। মানসী এখানে থাকলেও কি অসীম এতটা মদ্যপান করত?

একটু পরেই গৌতম বলল, চলল, এখন খেয়ে নেওয়া যাক। পরে আবার আড্ডা দেওয়া যাবে।

সবাই উঠে দাঁড়াল। মানবেন্দ্র বললেন, আপনারা যান, আমি একটু পরে আসছি।

মানবেন্দ্র ঠিক করেই ফেলেছেন, রাত্রে কিছু খাবেন না। ব্রান্ডির স্বাদটা জিভে চমৎকার লাগছে, খাদ্যদ্রব্যের মতো আজেবাজে জিনিস দিয়ে এটা নষ্ট করা উচিত নয়।

মানসী এ ঘরে আসেনি বলে মানবেন্দ্র একটুও দুঃখিত হননি। বরং মনে মনে একটু মজা পাচ্ছেন। সবাই যখন এই ঘরে, তখন মানসীর আলাদা ভাবে একা একা থাকার একটা তাৎপর্য আছে। তুমি ঠিকই করেছ। তোমাকে তো আমি ভিড়ের মধ্যে চাই না।

মানবেন্দ্র দেখলেন, গৌতমদের রেখে যাওয়া ব্র্যান্ডির বোতলে এখনও কিছুটা রয়েছে। তিনি উঠে গিয়ে গেলাসে আর একটু ঢাললেন। একটা ব্যাপার অন্তত বিস্ময়কর। মানবেন্দ্র এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কোনও রকম অসংবদ্ধতা নেই চিন্তায়। শরীরে ছটফটানি নেই। এটা কি অনেকখানি বাদে মদ্যপানের ফল? ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক তাহলে। পাগলের পক্ষে কোনও রকম উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। আজকের সুস্থতা তাকে আরও কোনও ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে টানছে।

একটা ঠকঠক শব্দে মানবেন্দ্র চমকে তাকালেন। ঠিক যেন দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু এ রকম গোপন সংকেতে কে তাকে ডাকবে? দরজা খুলে কারুকে দেখতে না পেয়েও মানবেন্দ্র অবাক হলেন না। মানসী এ-ভাবে আসবে না।

আবার সেই রকম শব্দে হতেই মুখ ফিরিয়ে তিনি দেয়ালের দিকে তাকালেন। প্রায় ঘুলঘুলির কাছে মাফিয়া টিকটিকিটা মথটাকে ধরে ফেলেছে। অত বড় মথটাকে মারবার জন্য সে দেয়ালের গায়ে ঠুকছে বার বার। এ-রকম করে ওরা। মথটাকে শেষ পর্যন্ত মরতে দেখে তিনি নিশ্চিত হলেন। ও তো মরতেই এসেছিল। কোনও সুন্দর জিনিসই বেশিক্ষণ থাকে না। অন্য দিকে শাইলক আর বেহুলা খুব কাছাকাছি। ওদের প্রণয় আসন্ন।

মানবেন্দ্র দেশলাইটা ছুঁড়ে মারলেন মাফিয়ার দিকে। ওর গায়ে লাগল না অবশ্য। মাফিয়া তার ভাঁটার মতো চোখে কটমট করে তাকাল মানবেন্দ্রর দিকে। তারপর বীরদর্পে সরে গেল খানিকটা। ফুলের পাপড়ির মতো মথটার ডানা টুকরো টুকরো করে খসে পড়ছে।

মানবেন্দ্র তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে প্যাড খুলে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন, মহারানির মৃত্যু। যেন এই নামে তিনি এক্ষুনি একটা রচনা শুরু করলেন। শিরোনামের তলায় কলমটা ঘষলেন কয়েকবার। তারপর লিখলেন, আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।

লাইনটা লিখেই তার ভুরু কুঁচকে গেল। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের লাইন লিখলেন কেন? তার নিজের চিন্তা প্রকাশ করার জন্যও কি রবীন্দ্রনাথের ভাষা দরকার? তার নিজস্ব ক্ষমতা কি শেষ হয়ে গেছে? চেষ্টা করেও মানবেন্দ্র একটাও নতুন লাইন ভাবতে পারলেন না?

কলমটা ছুরির মতো হাতে ধরে মানবেন্দ্র ভাবলেন, এই কি সেই মুহূর্ত? রথের চাকা বসে যাচ্ছে মাটিতে, আমি সব মন্ত্র ভুলে গেছি? ।

মানবেন্দ্র বিড় বিড় করলেন, আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।

তারপর বললেন, না, এসর্বনাশ পুরুষের নয়, নারীর। আমার নয়। আমি তো সর্বনাশের আশা নিয়ে কখনও বসে থাকব না, নিজেই নিজের সর্বনাশ করে যাব।

পাতাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিলেন জানলা দিয়ে। পরমুহূর্তেই তিনি নিজেকে ভীষণ একাকি বোধ করলেন। শীতের চেয়েও এই একাকিত্ব যেন বেশি শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

সমস্ত ব্রান্ডিটা শেষ করে মানবেন্দ্র বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দ্রুত খাবারের ঘরের দিকে এসে দেখলেন, ওদের খাওয়া সদ্য শেষ হয়েছে, ওরা বেসিনের কাছে জড়ো হয়েছে হাত ধোওয়ার জন্য। অসীমের কণ্ঠস্বর বেশ জড়ানো। কী যেন বলছে তাকে মানসী।

মানবেন্দ্র আর সেখানে ঢুকলেন না। তিনি টুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলেন হন হন করে। কোন দিকে যাচ্ছেন খেয়াল নেই। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে মুঠো পাকিয়ে ধরে আছেন ডান হাতে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মানবেন্দ্র হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছেন। খানিকটা বাদে পৌঁছে গেলেন পাথুরে এবড়োখেবড়ো জায়গাটায়। যার পর থেকে জমিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেই ঢালু জমিতেও খানিকটা নেমে মানবেন্দ্র দশ টাকার নোটটা বস্তির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, মুনিয়ার মা, তোমার মেয়েকে দুধ কিনে খাইও।

কথাটা বললেন বেশ চেঁচিয়ে নিজের গলার আওয়াজটা কানে আসতেই তিনি সজ্ঞানে এলেন। একটু চমকে ওঠার পর বোধ করলেন খানিকটা স্বস্তি ও আনন্দ। যাক, পাগলামির ধাতটা ব্র্যান্ডিতে সম্পূর্ণ যায়নি। বদ্ধ পাগল ছাড়া কেউ এ-রকম ভাবে টাকা দিতে আসে না। টাকাটা ছুঁড়ে দেওয়ার চেয়েও বড় কথা এই সময় এই ঝোঁক চাপা। সন্ধেবেলার কোনও ঘটনার সঙ্গে তো এর যোগ নেই। সাধারণ মাতালরাও এ-রকম করে না।

পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বেলে মানবেন্দ্র খুঁজতে লাগলেন টাকাটা। এ-রকম ভাবে খেয়ালের বশে টাকা ছুঁড়ে ফেলা তাকে মানায় না। তিনি গরিবের ছেলে। এখন অবস্থা সচ্ছল হলেও টাকার মর্ম বোঝেন।

টাকাটা খুঁজে পেয়ে মানবেন্দ্র ফিরতে লাগলেন আবার। এবার গতি অত্যন্ত ধীর। বিষম শ্রান্ত লাগছে। মুখখানা খুব বিষণ্ন হয়ে গেছে। কিছুই করার নেই এক জন মানুষের।

টুরিস্ট লজে ফিরে মানবেন্দ্র দেখলেন সব ঘরের আলো নিবে গেছে। সারা রাত জেগে আড্ডা দেবার পরিকল্পনাটা পরিত্যক্ত। অসীমের বেশি নেশা হয়ে গেছে বলেই বোধহয় তাকে ঘুম পাড়ানো দরকার। কিংবা ওরা মানবেন্দ্রর খোঁজ করে পায়নি। মানবেন্দ্র বুঝলেন, আজ আর বেশিক্ষণ জেগে থাকার ক্ষমতা নেই তার।

পা থেকে জুতোও খুললেন না, ঝুপ করে এসে পড়লেন বিছানায়। এবং বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন।

৭-৯. অনেক বেলা

জেগে উঠে মানবেন্দ্র দেখলেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। কাল রাত্রে তিনি দরজা-জানলা কিছুই বন্ধ করেননি। রোদ লুটোচ্ছে ঘরের মধ্যে।

প্রথমেই তার মনে হল, যাক, ওরা চলে গেছে।

কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন বাইরে শিশুদের কোলাহল। অন্য কোনও দল এসেছে। বিছানা ছেড়ে দরজার কাছে এসে দেখলেন, না, ওরাই। যাবার জন্য সেজেগুজে তৈরি, ভোর-ভোর বেরুতে পারেনি।

মানবেন্দ্র মুখ-হাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। খুব খিদে পেয়েছে। সোজা এসে বসলেন খাবার ঘরের টেবিলে।

ওদের মালপত্র এনে রাখা হয়েছে বারান্দায়। পুরুষ তিন জনই গাড়ির কাছে। বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে বাগানে। মানসী ওদের কী যেন খাওয়াতে গিয়ে খুব ব্যতিব্যস্ত। দৌড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে ওরা। এখান থেকে মানবেন্দ্র সব দেখতে পাচ্ছেন।

অনুরাধা বারান্দার একটা রেলিং ধরে তাকিয়ে আছে উদাসীন ভাবে দূরের দিকে। মানবেন্দ্র মানসীর দিকেই চোখ রেখেছেন। স্নান সেরে নিয়েছে মানসী, ভিজে চুল, আজ পরেছে একটা সাদা সিল্কের শাড়ি, মস্ত চওড়া কালো পাড়। আজ সকালে তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, এ পৃথিবীর নয়, অন্য কোনও গ্রহ থেকে বেড়াতে এসেছে।

মানসী নানা কাজে ব্যস্ত। ঘরের মধ্যে যাচ্ছে বার বার, কখনও বেতের বাস্কেটে কিছু ঢোকাচ্ছে কিংবা কিছু বার করছে তার থেকে। আবার ওরই মধ্যে ছেলে-মেয়েদের মুখে পুরে দিচ্ছে চামচে করে কোনও খাবার। এই ব্যস্ততাটুকুই সৌন্দর্য।

মানবেন্দ্রর মনে হল, আজ সকালবেলা তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, এই কথাটা, এই কথাটা মানসীকে এক্ষুনি বলা দরকার। চলে যাবার আগে মানসীকে এই কথাটা জানাতে না পারলে যেন মানবেন্দ্রর সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মানবেন্দ্র ভাবলেন, এক্ষুনি উঠে গিয়ে বলে আসব? যদি পরে আর সময় না পাওয়া যায়! অনুরাধা খুব কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে। কী করে বলা যাবে কথাটা? অথচ বলতেই যে হবে। মানবেন্দ্র এমনই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, তার শরীরে রোমাঞ্চ হতে লাগল। খাড়া হয়ে গেল হাতের লোম।

তিনি বিড় বিড় করে অসংখ্যবার বলতে লাগলেন ওই এক কথা এবং সর্বক্ষণ চোখ দিয়ে অনুসরণ করছেন মানসীকে।

একবার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। অন্যদের সামনেই বলে আসবেন কথাটা, তাতে যা হয় হোক। সেই সময়ই মানসী একটি বাচ্চার হাত ধরে এগিয়ে আসতে লাগল খাবার ঘরের দিকে। মানবেন্দ্রকে দেখে পরিচয়সূচক হাসি দিয়ে বেসিনের কল খুলল। বাচ্চাটার মুখ ধোওয়াবে।

মানবেন্দ্র ভাবলেন, আমি কি চিৎকার করে কথাটা ওকে জানাব? না, কাছে গিয়ে? শিশুটির সামনে? না, আলাদা? তিনি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন মানসীর দিকে, যদি সে আবার তাকায়।

বাচ্চাটার মুখ ধোয়া হতেই এক ছুটে পালাল। মানবেন্দ্র এগিয়ে এলেন বেসিনের দিকে। মানসী একটা বাটি আর তিনটে চামচ ধুচ্ছে।

মানবেন্দ্রকে দেখে মুখ তুলে মানসী বলল, আপনি হাত ধোবেন? আমার এক্ষুনি হয়ে যাবে।

মানবেন্দ্র ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো মানসীর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আজ সকালে–

পুরো কথাটা বলা হল না। দরজার কাছ থেকে অনুরাধা বলল, এই ফ্লাস্কে গরম জল নিয়েছিস?

গভীর দুঃখে মানবেন্দ্রর মুখটা কুঁচকে গেল। দুই নারীর পরস্পরের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যদি অনুরাধা চলে যায়, মানসী থাকে। যদি এক মিনিটের জন্যও তাকে একা পাওয়া যায়। একটা তো মাত্র বাক্য।

কিন্তু অনুরাধা গেল না। তার পাশে আবার হিরন্ময় এসে দাঁড়াল। তারপর অনুরাধার উদ্দেশে বলল, আপনাদের বেরুতে তো অনেক দেরি হয়ে গেল।

অনুরাধা বলল, গাড়িটা কী যেন গোলমাল করছে। আমরা তো সব তৈরি।

কথা বলতে বলতে ওরাও এসে ঢুকল খাবার ঘরে। মানবেন্দ্র তখনও মানসীর পাশে দাঁড়ানো। একটু সঙ্কুচিত বোধ করলেন। হিরন্ময় সিগারেট বাড়িয়ে দিতেই সেটা নেবার ছলে তিনি একটু সরে গেলেন দূরে। আর একবার কাতর দৃষ্টিপাত করলেন মানসীর মুখে, যে-মুখ আজ সকালবেলা অনেক বেশি সুন্দর।

কয়েকটা সামান্য কথা বলে মানবেন্দ্র চলে এলেন নিজের ঘরে। মুখে রীতিমতো রাগী ভাব। এ পৃথিবীটা আমার ইচ্ছে মতো চলছে না। আমি কেন মানসীকে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা বলতে পারলাম না?

ওরা যে-কোনও সময়ে চলে যাবে। প্রবাসে দুদিনের জন্য দেখা, যাবার সময় কিছু ভদ্রতা বিনিময় ছাড়া আর তো কিছু করণীয় নেই।

হুটোপুটি করতে করতে দুটো বাচ্চা ঢুকে পড়ল ঘরে। মানবেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করেই তারা খাটের চারপাশে দৌড়দৌড়ি করে আবার বেরিয়ে গেল।

মানবেন্দ্র ডাকলেন, রিনি, একটু শোন।

খেলা ছেড়ে রিনি এখন কথা শুনতে আসবে না। সাড়া না দিয়ে সে চলে গেল অন্য দিকে।

মানবেন্দ্র উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমল্লিকা ফুলটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

ফুলটি বলল, তুমি তো আমার কথা ভুলেই গেছ।

মানবেন্দ্র দেখলেন, ফুলটার ওপর একটা কাগজের টুকরো পড়ে আছে। কাল রাত্তিরে তিনি প্যাডের পাতাটা কুচিকুচি করে জানালা দিয়ে ফেলেছিলেন, তার একটা টুকরো।

মানবেন্দ্র টুকরোটা তুলে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে সর্বনাশের। তার হাসি পেল। আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়-এই লাইনটা তা হলে ফুলটির ক্ষেত্রেই সত্য।

তিনি দাড়ি কামাবার ব্লেডটা এনে অনেকখানি বোঁটাসুদ্ধ ফুলটাকে কুচ করে কেটে নিলেন। তারপর বললেন, তোমাকে আমি মানসীর হাতে তুলে দেব।

ফুলটা বলল, তুমি আমাকে মেরে ফেললে?

মানবেন্দ্র বললেন, সব সুন্দরের সঙ্গেই কিছু কিছু নিষ্ঠুরতা থাকে। তুমি তো তাজমহল কিংবা খাজুরাহো মন্দিরের সৃষ্টির ইতিহাস পড়োনি!

পেছন ফিরেই মানবেন্দ্র দেখলেন, দরজার কাছে মানসী। মানবেন্দ্রর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শব্দ হতে লাগল, ফুল সমেত হাতটা কেঁপে গেল।

মানসী বললেন, ইস, ফুলটা ছিঁড়ে ফেললেন?

অন্যায় করে ধরা পড়ে যাওয়া শিশুর মতো মানবেন্দ্র লজ্জা পেলেন প্রথমটায়। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তোমার জন্য।

মানসী বলল, এত বড় একটা ফুল নিয়ে আমি কী করব?

কিছু না! ফুল দিয়ে আবার কেউ কিছু করে নাকি?

মানসী এক পা ঢুকে এল ঘরের মধ্যে। মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, যাবার সময় হয়ে গেছে?

কী জানি! গাড়িটা বোধহয় গোলমাল করছে।

মানসী ফুলটা হাতে নিয়ে মুখের কাছে নিয়ে এল। মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন, মানসীর হাতে গিয়ে ফুলটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মানসী ফুলটা টেবিলের ওপর রাখার পর তিনি সে-দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

আপনি আমাকে তখন কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন?

এমন কিছু নয়।

বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন?

এমনিই।

মানবেন্দ্র সেই কথাটা বলতে এখনও দ্বিধা করলেন, কারণ আবার যদি বাধা পড়ে? যদি সম্পূর্ণ বাক্যটা শেষ করা না যায়!

আপনার ধরনধারণ কীরকম যেন অদ্ভুত!

আজ সকালবেলা তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে!

কী?

মানবেন্দ্র এমন বিচলিত ভাবে তাড়াতাড়ি কথাটা বললেন যে, সত্যিই সবটা বোঝা যায়নি। কিন্তু এক কথা দ্বিতীয় বার বলা আরও কঠিন। মানসী এখন বুঝতে না পারলেও পরে ঠিকই পারবে।

মানসী কিন্তু চা বাগানে যাবার জন্য মানবেন্দ্রকে একবারও বলেনি। মানবেন্দ্র প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন। এবার বুঝে গেলেন, ও বলবে না। এটাই ওর কায়দা।

মানসী জিজ্ঞেস করল, এখান থেকে ফিরে গিয়ে নতুন কী লিখবেন?

কী জানি!

আপনার লেখা যখন পড়ি–।

লেখার কথা থাক।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আপনার লেখার কথা মনে পড়েই।

মানসী, আর বেশি সময় নেই। সংক্ষেপে দু-একটা কথা আমাকে বলতে দাও! লেখক হিসেবে আমার ব্যর্থতা আমি জানি। যা লিখতে চাই, তার কিছুই লিখতে পারিনি। আমার একটিও লেখা পুরোপুরি সার্থক হয়ে ওঠেনি। এই ব্যর্থতা আমাকে সাঙ্ঘাতিক কষ্ট দেয়। আমি আস্তে আস্তে বোধহয় অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি। আমি কিছুতেই আর সব দিক সামলে চলতে পারি না। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?

কী সাহায্য?

তুমি আমাকে বাঁচাবে?

মানসী এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল মানবেন্দ্রর চোখের দিকে। মানবেন্দ্র দেখলেন একটা বিশাল জলাশয়। কুচকুচে কালো রঙের জল। তার মাঝখান দিয়ে একটা ধপধপে

রাজহাঁস সোজা এগিয়ে আসছে, চিরে যাচ্ছে জল। এই দৃশ্যটা মানবেন্দ্রকে এমনই মুগ্ধ করল যে, তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন মানসীর কথা।

মানসী বলল, এসব আপনি কী বলছেন?

আমি তোমার কাছে অসম্ভব ঋণী।

তার মানে? আমি কী করেছি?

তুমি যে তুমিই, সেটাই তোমার ঋণ।

এ তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

হ্যাঁ। কদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের ভূত আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে, আমার চিন্তাগুলো বেরিয়ে আসছে ওঁর ভাষায়।

রবীন্দ্রনাথের ভূত আবার কী? ছিঃ, এ-রকম ভাবে বলতে নেই।

ওটা আদরের কথা। রাগের নয়। থাক, শুধু শুধু দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার সাহায্য চাই। আমি তোমাকে–।

আমি কিছুই মানে বুঝতে পারছি না আপনার কথার।

তুমি এত সুন্দর, তোমাকে আমার দারুণ প্রয়োজন। আমি তোমাকে চাই–

একথা অন্য কেউ বললে –।

তুমি তাকে খুব খারাপ লোক ভাবতে!

না, তা নয়। অন্য কেউ বললে, তাকে উত্তর দেওয়া সহজ হত। কিন্তু আপনাকে উত্তর দেওয়া কঠিন।

মানসী পেছন ফিরে বাইরের দিকে একবার তাকাল। যেন সে দেখে নিল সংসারটা। তারপর বলল, আপনি আমাকে ভুল চোখে দেখেছেন। আপনাকে সাহায্য করার কোনও ক্ষমতা নেই আমার।

আছে।

আমি তো নিজে জানি, আমি কত সাধারণ।

তোমার জন্য একটা বেদি তৈরি করে দেব। তুমি তার ওপরে উঠে দাঁড়ালেই অসাধারণ হয়ে যাবে।

এ-সব কথা কবিতার মত, বাস্তব জীবনের নয়।

জীবনটা তো ইচ্ছে মতো তৈরি করে নেওয়া যায়।

আমি কি ইচ্ছে মতো সব কিছু করতে পারি? মেয়েরা পারে?

মানবেন্দ্র অধীর হয়ে উঠলেন। কথাবার্তা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আর তো বেশি সময় নেই।

মানবেন্দ্র নিজের বুকের ওপর হাত রেখে বললেন, তোমাকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে দুপ দুপ শব্দ হয়। আমার সারা শরীর কাঁপে কেন? তুমি এর উত্তর দাও? এ-রকম তো আর কখনও হয়নি?

মানসীর মুখে একটা দুঃখের রেখা ফুটে উঠল। মানবেন্দ্র সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিন্তু তোমাকে মিথ্যে কথা বলছি না। তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, একথা আমি অন্য কোনও মেয়েকে কখনও বলিনি।

মানসী বলল, আপনি আমাকে বিপদ ফেলে দিচ্ছেন। আমার নিজেরই অনেক সমস্যা আছে, ভেবেছিলাম আপনার কাছ থেকে সাহায্য চাইব।

তোমার কোনও বিষাদ নেই। তোমার কোনও সমস্যা নেই।

আমি কি রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ নই?

ছিলে এক সময়। এখন তার চেয়েও উঁচুতে।

আমার ভয় করছে এ-সব কথা শুনে। আমি চলে যাচ্ছি।

দাঁড়াও।

মানসীর মুখে লালচে রঙ ধরেছে। সেখানে মিশে আছে খানিকটা লজ্জা ও কাতরতা। অসহায় ভাবে বলল, আপনাকে আমার ভাল লাগে। কিন্তু আপনাকে যে সাহায্য করতে পারবে, আমি সে নই।

তুমিই।

আপনি আমাকে ভুল ভেবেছেন।

তুমি একটি বিবাহিতা মেয়ে, তোমাকে এ-রকম কথা বলা হয়তো অন্যায় মনে হতে পারে। তুমি কি অপমানিত বোধ করছ আমার কথায়?

না, আমি সে-সব কিছু ভাবছি না। আসলে আমার মনের মধ্যে- ।

লোকে যাকে বলে অবৈধ প্রেম, আমি তোমার কাছে ঠিক তা চাই না। তাছাড়া আমাকে প্রেমিক হিসেবে একদম মানায় না, আমি চাই পূজারি হতে। তুমিই একমাত্র আমাকে সুস্থতা দিতে পার। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি কোনও রকম ভাবে।

না, আমি জানি। তাছাড়া অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দেরি হয়নি, এই তো সময়।

আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। আমি ভেবেছিলাম, একটা ব্যাপারেই আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইব। কিন্তু তা আর হবে না। আমি খুব অসহায়। আমি যাই?

সেই সময় রিনি দরজার কাছে এসে লাফাতে লাফাতে বলতে লাগল, আমাদের আজ যাওয়া হবে, আমাদের আজ যাওয়া হবে না!

মানসী ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

রিনি আনন্দের সঙ্গে বলল, গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে।

মানবেন্দ্রর সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে মানসী মেয়ের হাত ধরে চলে গেল। ফুলটা সে নেয়নি।

এরপর ঘটনা বদলে গেল। সত্যিই ওদের সেদিন যাওয়া হবে না। গাড়িটাতে বেশ গোলমাল দেখা দিয়েছে। গাড়ির মিস্ত্রি এসে বলেছে, ইঞ্জিন নামাতে হবে, সারা দিনের কাজ।

মানবেন্দ্র কিন্তু এটা একটুও পছন্দ করলেন না। তার নিজের সুবিধের জন্য পুরো দলটিকেই এক দিন আটকে রাখতে তো তিনি চাননি। এরকম অবিবেচক তিনি নন। তাছাড়া, শিল্পের দিক থেকে এ রকম ব্যাপারের যুক্তি নেই। শিল্পের মানসীরা সাধারণত এই সময় ঠিকই চলে যায়। বিচ্ছেদই এই ধরনের ঘটনার নিয়তি। মানবেন্দ্রও ধরে নিয়েছিলেন মানসী চলে যাবে। গাড়ি খারাপ হওয়াটা একটা অত্যন্ত স্থূল ব্যাপার।

হিরন্ময়কে সে-দিন ফিরতেই হবে। সে যাবে ট্রেনে। মাইল সাতেক দূরে রেল স্টেশন। ওরা সবাই গেল হিরন্ময়কে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে। গৌতম একা রইল গাড়ির তদারকিতে।

একটু বাদেই টুরিস্ট লজে আরও দুটি গাড়ি-ভর্তি লোকজন এসে হাজির। এক গাড়িতে বাঙালি। রীতিমতো একটা সোরগোল পড়ে গেল। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শান্তিতে বই পড়া অসম্ভব। মানবেন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন। মন্দিরটা দেখা হয়নি, এইবেলা সেরে ফেলা যাক।

মন্দিরের কাছে গোটা দু-এক হোটেল আছে। অনেক লোকজনের ভিড় তাজা রোদ উঠেছে বলে, দিনটা বেশ আরামদায়ক। মানবেন্দ্র চত্বরে ঘুরতে লাগলেন নিজের খেয়ালে। একটা কথা বার বার তার মনে ঝিলিক দিতে লাগল। কয়েকটা ডিনামাইট এনে মন্দিরটা একেবারে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়? প্রচণ্ড শব্দে সব কিছু হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, আঃ, কী চমৎকার দৃশ্য। যে-কারণে মানবেন্দ্র একবার লাইব্রেরিতে আগুন লাগাতে চেয়েছিলেন, সেই কারণে তিনি এই মন্দিরটাকে ধ্বংস করতে চাইছেন। তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় পাথরের টুকরে ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে।

মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে শারীরিক আনন্দের প্রদর্শনী। নারী ও পুরুষ পরস্পরকে ভোগ করছে। কয়েকটা মূর্তি দেখার পরই মানবেন্দ্র শরীরে বেশ যৌন উত্তেজনা বোধ করলেন। যাক, তাহলে আর সন্দেহ নেই যে এগুলি শিল্প। নগ্ন নারীর চিত্র দেখলেও যদি মনে মহৎ ভাব জাগে, তাহলেই সেগুলো শিল্প হবে-এ-কথা বলত আগেকার সমালোচকরা। যত সব গাঁজাখুরি কথা। নগ্ন মূর্তি দেখে যার উত্তেজনা হয় না, সে তো শিল্পের কিছু বোঝেইনা। তাকে নপুংসকই বলতে হবে। রদ্যাঁ যেমন ছিলেন এক জন নীতিহীন দৈত্য, তাই সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

মন্দিরের গায়ে কেন এই সম্ভোগ চিত্র? উত্তরের জন্য সমালোচকরা মাথা খুঁড়ে মরুক। আমার দেখতে ভাল লাগছে, সেটাই যথেষ্ট। এটা শুধু একটা মন্দির হলে আমি দেখতে

আসতাম না। মন্দিরের ভেতরে কাল্পনিক মূর্তি, বাইরে নারী-পুরুষের শরীরে পূজা। ব্যাপারটা বেশ মজার।

মন্দিরের চত্বরে প্রচুর মানুষজনের মধ্যে দুটো গাধাও চড়ে বেড়াচ্ছে অনাবশ্যক ভাবে। সে দুটিকে দেখে মানবেন্দ্র বেশ কৌতুক বোধ করলেন। ওদের এখানে কে পাঠিয়েছে? সেই যে পৃথিবীতে কোথাও একটা কার্যকারণের হেড অফিস আছে, সেখান থেকেই নাকি? হতেও পারে। কেননা, কোনও কোনও সন্ন্যাসী শরীরের তুলনা দিয়েছেন গাধার সঙ্গে। শরীরটা একটা গাধা!

মানবেন্দ্র একটা গাধার গায়ে হাত রাখলেন। নিরীহ প্রাণীটি সেই জায়গার চামড়াটা বার বার কোঁচকায়।

মানবেন্দ্র বললেন, ওহে, অ্যাসিসিতে ফ্রান্সিস বলে এক জন সাহেব সাধু ছিল। সে তোমাদের খুব সম্মান করেছে। জানো না বোধহয়! আর এক জন নোবেল প্রাইজ পাওয়া কবি, হিমেনেথ, কবিতা লিখেছেন তোমাদের এক জনকে নিয়ে। সুতরাং তোমাদের দিকেও লোক আছে।

একটা গাধা হঠাৎ এমন ভাবে ডেকে উঠল যে, মানবেন্দ্র চমকে তিন পা পিছিয়ে গেলেন। কাছাকাছি কয়েকটা বাচ্চা ছেলে হেসে উঠল। মানবেন্দ্র গাধা দুটির উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কিন্তু তোমাদের দিকে নই। আমি ওই মন্দিরের দেয়ালের দিকে।

গাধাটাকে ছোঁয়ার জন্য হাতটা একটু নোংরা-নোংরা লাগছে। অদূরে বটগাছের তলায় একটা জলের কল। মানবেন্দ্র সেখানে এলেন হাত ধুতে। পাশেই কাঠের বেঞ্চে বসে আছে এক জোড়া বিদেশি। পুরুষটি প্রায় সত্যজিৎ রায়ের মতো দীর্ঘকায় এবং সুদর্শন। এই শীতের মধ্যেও মেয়েটি পরে আছে মিনি স্কার্ট; সে সুন্দরী নয়, কিন্তু তার স্বাস্থ্য এমনই চমৎকার যে শরীর থেকে একটা শোভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

মানবেন্দ্র তিনবার তাকালেন মেমটির দিকে। তারপর মনে মনে বললেন, অ্যাসিসির সন্ত ফ্রান্সিস কি এই রকম একটা শরীরকেও গাধা বলতে চেয়েছিলেন। সন্তফ্রান্সিস, আপনি হেরে গেছেন। যেমন হেরে গেছেন যিশু ও গৌতম বুদ্ধ। পৃথিবীটা ওঁদের মত অনুযায়ী চলেনি। খ্রিস্টান আর বৌদ্ধরা মাঝে মাঝে পৃথিবী জুড়ে কী মারপিটই না শুরু করে।

ভারতীয় গাইডটি সাহেব-মেমের জন্য একটা ম্যাপ-বই জোগাড় করে আনতে গিয়েছিল। অবিলম্বে সে হতদন্ত হয়ে ফিরে এল, এবং গদ গদ কণ্ঠে নানা কথা বলতে লাগল। তার ভাঙা ইংরেজি থেকে মানবেন্দ্র এইটুকু সংগ্রহ করতে পারলেন যে, ওই দীর্ঘকায় পুরুষটি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। নিঃসন্দেহে এক জন জ্ঞানী লোক। তার সঙ্গে ওই মেয়েটি কে? এই ধরনের মেয়েদের মার্কিন ইংরেজিতে বলে ডল। সত্যি, রক্তমাংসের একটি চিত্তহারী জ্যান্ত খেলনা।

অত বড় এক জন পণ্ডিতও একটি সুন্দর খেলনা নিয়ে এত দূর বেড়াতে এসেছেন। আর মানবেন্দ্র তার অসুস্থতার চিকিৎসার জন্যও মানসীকে পেতে পারেন না?

ডাকবাংলোতে ফিরতে মানবেন্দ্রর বেশ দেরি হল। ততক্ষণে মানসী-অসীমরা ফিরে এসেছে, খাওয়া-দাওয়াও হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে, সকালবেলা মানসীকে তিনি যা যা বলেছিলেন, তার প্রত্যেকটি কথা আবার উচ্চারণ করতে লাগলেন, যাচাই করে দেখছেন, তার কোনও ভুল হয়েছে কি না। ভুল বা ঠিক যাই হোক, সব ব্যাপারটাই স্বতঃস্ফূর্ত। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

মানসী কি আবার তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে? একা? মানসীর উত্তরগুলো ঠিক যেন বোঝা যায়না।

তার চোখ জুড়ে ভেসে উঠল মানসীর মুখ। এই মেয়েটির দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে, যা মানবেন্দ্র কিছুতেই ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না। ও যেন কিছু বলতে চায়। মানসী বলেছিল, ওরও কিছু গোপন কথা আছে। গোপন কথা মানে কি দুঃখ?

মানসী, আমি তোমাকে দেবতার আসনে বসাব। তোমাকে পুজো করতে না পারলে আমার নিস্তার নেই। আমি কোনও দিন কোনও ঠাকুর-দেবতার পায়ে ফুল দিইনি। তোমার পায়ের পাতায় আমি চুম্বন দেব। তোমাকেই, শুধু তোমাকে, আর কারুকে নয়। তুমি তো সেই জন্যই এসেছ। নইলে হঠাৎ এই সময়, কলকাতা ছেড়ে এত দূরে এই মন্দিরে দেখতে আসার মানে কী? ঘটনাটি এই নয় যে, আমি ডাকবাংলোতে হঠাৎ একটি মেয়েকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছি। আমাকে যে আকর্ষণ করবে, সেই রকম একটি মেয়েই ঠিক এই সময়ে এসেছে। তোমার স্বামী আছে, দুটি সন্তান আছে, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। তোমাকে যথেষ্ট দিলেও তোমার কিছুই কমবে না এক তিলও। কোনও রকম মালিন্য ছুঁতে পারে না তোমাকে।

একটি মেয়েকে পুজো করা আবার কী ব্যাপার? যে কেউ শুনলেই বলবে পাগলামি। হ্যাঁ তাই। বৃহত্তর পাগলামি থেকে বাঁচবার জন্য এই সব ছোটখাটো পাগলামি আমার দরকার। আমি এই রকম ধাতুতে গড়া।

বিকেলবেলা মানবেন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন, মানসী-অনুরাধারা সবাই একটা সিনেমায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শহরের মধ্যে বাজারের কাছে একটি রিকেটি চেহারার সিনেমা হল আছে, সেখানে বহুকালের পুরনো হিন্দি ছবি দেখানো হয়। সেই ছবি দেখার জন্য ওদের উৎসাহ। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সাংস্কৃতিক জীবনটা বড্ড গোলমেলে। যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে, তারাও হিন্দি সিনেমা দেখে নিয়মিত। অবশ্য, বাইরে বেড়াতে এসে যে-কোনও একটা সিনেমা দেখার উৎসাহ অন্য রকম।

মানবেন্দ্র চেষ্টা করলেন মানসীর চোখে চোখ ফেলতে। তুমি কি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ? না, সেটা সম্ভব নয়, পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও আমি তোমাকে তাড়া করে যাব। সব মানুষই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। আমাকেও বাঁচতে হবে তো!

মানবেন্দ্র কাছাকাছি এসে পড়ার পর মানসী লঘু গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে?

মানবেন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, না!

অসীম বলল, যাঃ, ওনাকে কী এই সব আজেবাজে সিনেমা দেখতে বলছ! আমরা যাচ্ছি নেহাত তোমাদের পাল্লায় পড়ে।

অনুরাধা বলল, মোটেই বাজে না। এটা দিলীপকুমারের প্রথম ছবি!

ওদের আগেই মানবেন্দ্র বেরিয়ে এলেন টুরিস্ট লজ থেকে। মুখে অস্বস্তির চিহ্ন। মানসীকে না বলার পর মানবেন্দ্রর একবার মনে হয়েছিল, রাজি হলে ক্ষতি ছিল কী! কত আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। কত বিরক্তিকর সভা-সমিতিতে বসে থাকতে হয়, কিন্তু সেই তুলনায় ঘণ্টা তিনেক যে-কোনও একটা সিনেমা দেখলে এমন কী ক্ষতি ছিল! এমনকী, তিনি হয়তো মানসীর পাশে বসার সুযোগ পেলেও পেয়ে যেতে পারতেন। পাশে না বসলেও কাছাকাছি তো। মানসীর শরীরে সুগন্ধ, তার মুখের পার্শ্বচিত্র—এ-ও তো অনেকখানি পাওয়া।

তবু মানবেন্দ্র একটুখানি চিন্তা না করেই না বলেছিলেন মানসীকে। এ-রকম তার স্বভাব। কোনও একটি জিনিস পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার দিকেই যেন তার ঝোঁক বেশি। প্রথম জীবনে, যখন তার চাকরি পাওয়ার খুব দরকার ছিল, ঘুরতে হয়েছিল অনেক দরজায় তখনও এমন হয়েছে, কোনও এক জন বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে গেলে চাকরির সুরাহা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, তবু মানবেন্দ্র সেই লোকটির বাড়ির কাছে এসেও ফিরে গেছেন। অন্য লোকের সঙ্গে এলে, সেই বাড়ির দরজায় আঘাত দেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছেন, উনি যেন এখন বাড়িতে না থাকেন!

সত্যিই বাড়িতে না থাকলে মানবেন্দ্র ভেবেছেন, যাক বাঁচা গেল! পরক্ষণেই দুঃখ হয়েছে, ইস, এবারেও চাকরিটা হল না।

নারীদের ক্ষেত্রেও হয়েছে এ-রকম। প্রথম যে-মেয়েটির জন্য পাগল হয়েছিলেন মানবেন্দ্র, সেই শ্রাবন্তীকেও তিনি প্রায় স্বেচ্ছায় চলে যেতে দিলেন হিরন্ময়ের কাছে। শ্রাবন্তীকে

অসম্ভব ভালবাসতেন অল্পবয়েসি যুবক মানবেন্দ্র, কিন্তু যখন তিনি দেখছিলেন হিরণ্ময় আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে শ্রাবন্তীর দিকে, তখনও তিনি বাধা দেননি। অথচ একটিমাত্র কথা বললেই হত। হিরন্ময় খুব ভদ্র, সে কখনও জোর করত না। আর, শ্রাবন্তীকে শুধু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, মানবেন্দ্র তাকে কতখানি চান। প্রত্যেক দিন এ-জন্য মানবেন্দ্র নিজেকে তৈরি করে রাখতেন আগে থেকেই। অথচ শ্রাবন্তীর বাড়ির কাছে এসে ভেবেছেন, আজ না, কাল বলব। তারপর এক দিন যখন চৌরঙ্গিতে চায়ের দোকানে শ্রাবন্তী জানাল, আমি হিরন্ময়কে বিয়ে করছি, জানি না, ভুল করছি কি না, তখন মানবেন্দ্র নিশ্চিত বোধ করেছিলেন। যাক, সময় পেরিয়ে গেছে। আর কিছু বলতে হবে না।

পরবর্তী কালে অন্তত দুখানি উপন্যাস ও পনেরোটি কবিতায় তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকাশ করেছেন শ্রাবন্তীকের না-পাওয়ার বেদনা।

মানবেন্দ্র অস্ফুটভাবে বললেন, মানসী, তুমি আমাকে ময়নাগুড়ির চা বাগানে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করোনি, আজ শুধু একটা সিনেমায় যাবার জন্য বললে! আমি এত সহজে ভুলি না।

মানবেন্দ্র হাঁটতে হাঁটতে এসে সেই উঁচু পাথরটায় বসলেন। নিচে ঢালু জমিতে সেই বস্তি। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে আজ। শালটা ভাল করে মুড়ি দিয়ে বসলেও শীত কমে না। এই শীতের মধ্যে একা বাইরে বসে থাকা উপভোগ্য নয়। তবু মানবেন্দ্র উঠে গেলেন না।

মুনিয়ার মা কিংবা মুনিয়াকে দেখা যাচ্ছে না। কালকে রাত্তিরে ঘোরের মাথায় মানবেন্দ্র ওই বস্তিতে নেমে যাচ্ছিলেন আর একটু হলে। একটা বিশ্রী ব্যাপার হত। কেউ বুঝতে পারত না আসল ব্যাপারটা। বোঝারও তো কিছু নেই।

আজ আকাশ, প্রান্তর, দিগন্ত বা সূর্যাস্ত –কোনওদিকেই তার চোখ যাচ্ছে না। ক্ষুধার্ত লোক যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে না, সেই রকম মানবেন্দ্রও শুধু মানসীর কথা চিন্তা করছেন। এই অবৈধ চিন্তাটিতে তিনি রীতিমতো উত্তেজনা বোধ করছেন, শরীরটা একেবারে সৈনিকের মতো সুস্থ।

কিন্তু এরই মধ্যে এক সময় তিনি মানসীর মুখটা ভুলে গেলেন। খুব চেষ্টা করেও মনে করতে পারছেন না। অন্যান্য পরিচিত মেয়েদের মুখ এসে ভিড় করছে। দীপা, শ্রাবন্তী, নন্দিনী, রেণু, মনীষা–এমনকী খুব অল্প অল্প চেনা যেসব মেয়ে, যেমন দীপ্তি, সান্ত্বনা – আর মানসী, যাকে তিনি একটু আগেও দেখেছেন, তার মুখটাই মনে পড়ে না! এ কীরকম?

মানবেন্দ্র মাথার চুল চেপে ধরলেন। নিজেকে প্রচণ্ড কিছু শাস্তি দেওয়া দরকার। এই পাথরের ওপর থেকে নিচের বস্তিটার দিকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? উল্লুক, শেষ করে দেব তোমাকে। দাও, মানসীকে ফিরিয়ে দাও, এক্ষুনি!

মানসীর গলার আওয়াজ, হাঁটার ভঙ্গি সবই স্মরণ আছে। শুধু তিনি ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছেন না। সব চেয়ে বেশি করে যাকে চাই, না-পাওয়া তাকেই জড়িয়ে থাকে। মানুষ যা মনে রাখতে চায় না, শুধু সেটাই নাকি ভুলে যায়। আমি মানসীকে মনে রাখতে চাই না?

অসম্ভব রাগী মানুষের মতো মানবেন্দ্র নিজের স্মৃতিকে বললেন, আমি তোমাকে দশ পর্যন্ত গোনার সময় দিলাম।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুনতে লাগলেন, এক, দুই, তিন –।

দশ গোনার পরেও মানসীর মুখচ্ছবি ফিরে এল না।

মানবেন্দ্র পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে নিচের দিকে এক লাফ দিলেন।

ধুতি পরে না থাকলে ওই সময়েই তার মৃত্যু ঘটা বিচিত্র কিছু ছিল না। কিন্তু ধুতিতে পা জড়িয়ে যাওয়ায় লম্ফটি বিশেষ সুবিধের হয়নি। তবু নিচে পড়ে মানবেন্দ্র বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেলেন। হ্যাঁচোড়-প্যাচোড় করে কোনও রকমে সামলে নিলেন নিজেকে।

ডান পায়ের হাঁটুর কাছে অনেকখানি কেটে গেছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে ধুতি। তবু মানবেন্দ্র প্রথমেই চারদিকটা একবার দেখে নিলেন। অন্য কেউ দেখে ফেলেনি তো! দেখলে ব্যাপারটা হাস্যকর হত। তারা ভাবত, এক জন জলজ্যান্ত পূর্ণ বয়স্ক লোক পাথর থেকে আপনা আপনি পড়ে গেছে।

খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে থেঁতো করে তিনি সেই কাটা জায়গাটায় লাগালেন। জায়গাটায় বেশ জ্বালা জ্বালা করছে। শরীরে এ-রকম কোথাও কেটে গেলে তখনই আবার নতুন করে বোঝা যায়, শরীরটা কত প্রিয়। হাঁটতে গিয়ে তাকে একটু একটু খোঁড়াতে হল। আর কোথাও মচকে-টচকে যায়নি তো!

এই সময় মানবেন্দ্র দেখলেন, বস্তির দিক থেকে মুনিয়া উঠে আসছে ওপরের দিকে। মানবেন্দ্র সোজা হয়ে ঠিকঠাক পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন। ধুতিতে রক্তটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, এটা এক্ষুনি বদলানো দরকার।

একটুখানি হেঁটে আসার পর মানবেন্দ্রর মনে পড়ল, মুনিয়ার কাছে তার কিছু ঋণ আছে। তিনি পিছন ফিরে মুনিয়াকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

মুনিয়া কাছে আসতেই তিনি পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মুনিয়া অবাক হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, এমনিই, তুমি কিছু কিনেটিনে খেয়ো।

মুনিয়া তবু দাঁড়িয়ে রইল। মানবেন্দ্রর এটা পছন্দ হল না। ও এখন চলে গেলেই তো পারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী অসুখ?

মেয়েটি বলল, কিছু না।

ঠিক আছে, যাও। তোমার মাকে বলল, দুধ কিনে দিতে।

পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, তিনি মুনিয়াকে পাঁচ টাকা ঠকাচ্ছেন। কাল রাত্তিরে তিনি ওর উদ্দেশে দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আর আজ সুস্থ অবস্থায় এরই মধ্যে পাঁচ টাকা বাঁচাবার চেষ্টা। একবার দিয়ে আবার নিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় না!

তিনি পকেট থেকে আরও পাঁচটা টাকা একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার করে আবার এগিয়ে দিলেন মুনিয়ার দিকে। বললেন, এই নাও, এটা ভুলে গিয়েছিলাম।

মুনিয়া বলল, কী করব? মাকে দেব?

হ্যাঁ।

মুনিয়া দৌড়ে চলে গেল। একটু বাদেই শোনা গেল মুনিয়ার মায়ের গলা। এই দিকেই যেন আসছে।

মানবেন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। মুনিয়ার মা বেশ দজ্জাল ধরনের স্ত্রীলোক। এই টাকা দেওয়ার ব্যাপরটার সে যদি অন্য কোনও মানে করে? অনেকসময় গরিবদেরও আত্মসম্মান বোধ থাকে। সেটা আবার এক অস্বস্তিকর ব্যাপার।

হন হন করে তক্ষুনি পা চালিয়ে, প্রায় দৌড়ে মানবেন্দ্র রওনা হলেন টুরিস্ট লজের দিকে। শেষ পর্যন্ত মুনিয়ার মা তাকে ধরতে পারেনি।

টুরিস্ট লজের গেটে পা দেবার পর মানবেন্দ্রর মনে পড়ল, মানসীর মুখখানা মনে পড়ছে না বলে নিজেকে শাস্তি দেবার জন্য তিনি পাথর থেকে লাফ দিয়েছিলেন। কিন্তু পা কাটার পর এতক্ষণের মধ্যে আর একবারও তিনি মানসীর কথা ভাবেননি। এটাও অদ্ভুত নয়? মানুষের জীবনে যে কত মজার ব্যাপার আছে।

.

০৮.

ধুতিটা বদলে একটা প্যান্ট পরে মানবেন্দ্র একটা চেয়ার টেনে বসলেন বারান্দায়। ওরা কেউ এখনও ফেরেনি। কিন্তু মানবেন্দ্রর এখন ঘরের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তিনি নিজেই এখন মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য ব্যাকুল।

মানসীরা ফিরল বেশ রাত্তির করে। বাইরে থেকেই খেয়ে এসেছে। জিনিসপত্রও কেনাকাটি করেছে অনেক কিছু, সিনেমা হলের পাশেই হাট বসেছিল। অনেক ঘোরাঘুরি করে এসে সবাই খুব ক্লান্ত।

আজও দেখা গেল, অসীম বেশ নেশা করেছে। তার চোখ লাল, পা টলছে, যদিও কথাবার্তা বলছে না একেবারেই, মনে হল সবাই যেন অসীমকে নিয়ে একটু বিব্রত। অসীমের এই পরিচয়টা প্রথম দিকে বোঝা যায়নি। এত ভদ্র ও বিনীত যুবক, সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী। দুটি ফুটফুটে বাচ্চা, সব ব্যাপারেই অসীম বেশ দায়িত্ববান, তবু তার এ-রকম নেশা করার ঝোঁক কেন? মানসী আর গৌতম অসীমকে ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

আজ আর আড্ডা জমল না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তাছাড়া বাগানে আজ বসবার জায়গাও নেই, নতুন যাত্রীরা সব কটা চেয়ার দখল করে নিয়েছে।

গৌতম গাড়িটাকে মোটামুটি চালু করেছে, কিন্তু পুরো ঠিক হয়নি। এই অবস্থায় গাড়ি নিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া যাবে না। ওদের পরিকল্পনা একটু বদলেছে। কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়বে, কাছাকাছি একটা বড় শহরে গিয়ে গাড়িটাকে আবার ভাল করে দেখাতে হবে। অসীমরাও এবার বোধহয় আর ময়নাগুড়ি চা বাগানে যাবে না, কলকাতার ট্রেন ধরবে। কলকাতায় কী যেন একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। কিংবা অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে।

একটু বাদেই যে-যার ঘরে চলে গেল।

ওরা একটা অতিরিক্ত দিন থাকার ফলে মনে হয়েছিল যেন অনেকরকম নতুন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সারাটা দিন এলেবেলে ভাবে কেটে গেল। তাহলে

ওদের গাড়ি খারাপ হল কেন? কেন আর একটা দিন থাকতে হল? কার্যকারণের হেড অফিসের এটা একটা সাঙ্ঘাতিক ভুল। বাকি আছে শুধু রাত্তিরটা।

মানবেন্দ্র ক্ষুব্ধভাবে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। এরই মধ্যে শুয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু আর কী-ই বা করার আছে। ওরা এত তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে চলে গেল! গৌতম আর অসীমও যদি আসত! এখন আর বই পড়ার মেজাজ নেই, এত রাত্তিরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় না, হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে।

বাগানে নতুন লোকদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কাল ভোরে মানসীরা চলে যাবে। হয়তো এই নতুন লোকদের কারুর সঙ্গে মানবেন্দ্রর আলাপ হবে। আবার অন্য রকম কথাবার্তা। নতুন যারা এসেছে তাদের মধ্যেও এক জন রূপসী নারী ও দুটি সুশ্রী কিশোরী রয়েছে, কিন্তু মানবেন্দ্র কোনও আগ্রহ বোধ করেননি। একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, শুধু রূপের জন্য মানসী তাকে এমন ভাবে উতলা করেনি। মানসীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা রূপের চেয়ে বেশি।

মানবেন্দ্র এখানে এসেছিলেন, কারুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না করে শুধু চুপচাপ একা কাটাবার জন্য। কিন্তু এখন, ওরা তার সঙ্গে আর একটুক্ষণ কথা না বলে শুতে চলে গেল বলে তিনি অপমানিত বোধ করছেন।

এর আগে, কখনও এরকম একা কোনও জায়গায় বেশি দিন থাকেননি মানবেন্দ্র। ডাকবাংলো বা টুরিস্ট লজে অনেক বার এসেছেন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, নিজেরাই হই-হল্লা ও উদ্দামতায় এমন ভাবে মেতে থাকতেন যে, সময় পার হয়ে যেত আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে। অন্য কারুর দিকে নজর দেবার মতো অবস্থা থাকত না। এবার তিনি টের পাচ্ছেন, একা একা থাকা কত শক্ত। মানসীরা যদি এখানে না আসত, তাহলে কি এ-রকম অস্থিরতা জাগত?

হাতের বইখানা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, মানসীকে আমার চাই! আমি আর কোনও কথা শুনতে চাই না, চাই, চাই, আজ রাত্রেই, ও চলে যাবার আগেই।

মানবেন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। বাইরে বেরুবার উপায় নেই, সেখানে নতুন লোকরা বসে আছে এখনও। যদি ওরা আলাপ করতে চায়! এখন মানসী ছাড়া আর কোনও প্রাণীর সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান না।

এক একবার থমকে দাঁড়িয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আজ সন্ধের পর থেকে মানসী তার সঙ্গে ঠিক কটা কথা বলেছে। বেশিনয়, সামান্যই। মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করেছিলেন, ফিরতে এত দেরি হল? মানসী বলেছিল, কাল তো চলে যেতেই হবে, তাই জায়গাটা আবার ভাল করে ঘুরে দেখে এলাম।

অর্থাৎ চলে যেতে হবে বলে মানসী জায়গাটাকে আবার দেখছে। এখানকার মানুষদের শেষবার দেখে যেতে চায়নি। মানবেন্দ্র দুঃখিত হয়েছিলেন। এর পরেই মানসী বলেছিল, আপনার কাছ থেকে কয়েক লাইন লিখিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় গিয়ে অন্যদের দেখাতাম।

মানবেন্দ্র বলেছিলেন, আচ্ছা, লিখে দেব।

কিন্তু মানসী সেটা কখন লিখিয়ে নেবে, কাল ভোরবেলা? তখন কি সময় হবে? মানবেন্দ্রর যদি তখন ঘুম না ভাঙে!

মানসী বলেছিল, কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসবেন? আপনি তো খুব ব্যস্ত?

অথচ মানসী কলকাতায় তাদের বাড়ির ঠিকানা বলেনি। হয়তো ভেবেছে, সেটা অসীমই জানিয়ে দিয়েছে।

যাই হোক, এ-সব খুবই সাধারণ। অথবা বলা যায়, কথার কথা। রাত্তিরে এই কথা নিয়ে বার বার চিন্তা করার কিছু নেই। তবে মানসী যে-কোনও কথা বলার সময়েই চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। অনেকেই চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাতে পারে না। মানসী যখন চেয়ে থাকে, তখন মনে হয় সে যেন আরও কিছু বলতে চাইছে। মানবেন্দ্র

চোখের ভাষা বুঝতে পারেন না। এই জন্য তিনি জীবনে অনেক বার পরাজিত হয়েছেন। তিনি খুব ভাল করে চেনেন স্পর্শের ভাষা। মানসী যদি একটা আঙুল দিয়েও তাকে একবার ছুঁয়ে দিত।

মানসীকে আমার চাই! আমি ওকে পুজো করব। আমি ওর সর্বনাশ করব! ও কেন এখানে এসেছে? ও কেন আমাকে চেনে? কেন ওকে দেখলে আমার বুক কাঁপে? এর মূল্য ওকে দিতেই হবে। আমি যেমন ওর কাছে ঋণী, তেমনি মানসীও ঋণী আমার কাছে। পূজারির কাছে দেবতাও কি ঋণী থাকে না?

পায়চারি করতে করতে মানবেন্দ্র মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে দেখছেন বাইরে। নতুন লোকেরা তখনও বসে আছে সেখানে। এত শীতের মধ্যেও ওরা কেন এতক্ষণ বসে থাকতে চায় বাগানে? মানবেন্দ্র পাগল সেজে ওদের ভয় দেখিয়ে আসবেন?

এই চিন্তাটা মানবেন্দ্রকে বেশ আকৃষ্ট করল। আধা পাগলের পক্ষে পুরো পাগল সাজা খুবই সহজ। পাগল দেখলে সবাই ভয় পায়। ওদের এমন ভয় দেখাতে হবে যাতে এক্ষুনি পালিয়ে যায়।

মানবেন্দ্র সত্যিই চাদরটা মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধলেন, প্যান্টের পা দুটো গুটিয়ে নিলেন অনেকটা, তারপর খোলা খিলটা হাতে নিয়ে নিলেন। বাথরুমের আয়নায় দেখতে গেলেন, তাকে কী রকম দেখাচ্ছে।

নিজের চেহারা দেখে নিজেরই হাসি পেল তার। আরও ভয়ঙ্কর করবার জন্য আয়নার সামনে কয়েক বার লাফিয়ে নাচানাচি করলেন। হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি এই চেহারায় আয়নার সামনে নাচানাচি করার একটা নেশা লেগে গেল। এবং একবার ঝোঁকের মাথায় লাঠিটা ঠক করে ঠুকে গেল আয়নায়।

আয়না জিনিসটা ভঙ্গুর, কিন্তু এত ফঙ্গবেনে হবার কোনও মানে হয় না। এই সামান্য আঘাতেই আয়নাটার মাঝখান থেকে চিড়ে গেল অনেকটা। টাকার চিন্তায় পাগলামিও

সাময়িক ভাবে কেটে যায়। কত গুনাগার দিতে হবে? মানবেন্দ্র আয়নার দাম জানেন না, তবু মনে মনে ভাবলেন, অন্তত তিন-চারশো টাকা নিশ্চয়ই। একবার চিন্তা করে নিলেন, এই টাকাটা দিলেও তার চলবে কিনা।

লাঠিটা নামিয়ে রেখে ফাটা আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেন আবার। পাগড়িটা খুলে ফেললেন। এবার বেশ চেনা যাচ্ছে এক জন হেরে যাওয়া মানুষকে। এক জন সার্থক হেরে যাওয়া মানুষ।

দেয়াল থেকে কেউ বলল, ঠিক ঠিক ঠিক।

মানবেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন, মাফিয়া এসে বাথরুমের দেয়ালে আশ্রয় নিয়েছে। ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মানবেন্দ্র লাঠিটা আবার তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বুঝি সব জায়গায় জিতে যাও।

টিকটিকিটা বলল, আমি যা চাই, তা ঠিকই পাই।

মানবেন্দ্র শান্তভাবে বললেন, তোমাকে আমি এক্ষুনি খুন করতে পারি। তুমি কি মৃত্যু চেয়েছিলে?

মৃত্যুচিন্তা আছে তোমার। আমরা ও-সব কথা ভাবিই না।

তুমি সুখী?

নিশ্চয়ই। তোমরাই তো দুঃখ তৈরি করো।

আচ্ছা, তাহলে দেখো, মরতে কেমন লাগে।

মানবেন্দ্র বিদ্যুৎ বেগে লাঠিটা দিয়ে আঘাত করলেন ওকে। কিন্তু মাফিয়া তার চেয়েও দ্রুতগতিতে সরে গেছে। ঠাস করে লাঠির শব্দ হল দেয়ালে। সে কিন্তু প্রাণভয়ে একেবারে পালাল না। খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ঘাড় তুলে তাকিয়ে রইল।

মানবেন্দ্র আবার মারতে গেলেন তাকে। কিছুক্ষণ এই রকম খেলা হল। শেষ পর্যন্ত মাফিয়া যেন অনেকটা বিরক্ত হয়েই ঢুকে গেল ঘুলঘুলির মধ্যে। যাবার আগে মানবেন্দ্রকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে গেল।

মানবেন্দ্র বাথরুম থেকে ঘরে এসে চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। টিকটিকিটার চিন্তা মন থেকে তাড়াবার জন্য তিনি একটা সিগারেট ধরালেন।

তখন তার মনে হল, টুরিস্ট লজে এখনও কয়েকটা ঘর খালি আছে। অনেক সময় সেই ঘরগুলোর দরজা খোলাই থাকে। এক সময় চুপি চুপি সেই রকম খালি ঘরের বাথরুমে ঢুকে সেখানে এই ভাঙা আয়নাটা রেখে ভাল আয়নাটা নিয়ে এলেই হবে। তাহলে কেউ আর তাকে দোষ দিতে পারবে না।

মানবেন্দ্র এটা ভাবলেন বটে, কিন্তু করা হয়ে উঠবেনা। একটা ভাঙা আয়না হাতে নিয়ে তিনি চুপি চুপি অন্য ঘরে ঢুকেছেন, এ দৃশ্যটা অবাস্তব। সমস্ত চিন্তাকেই কার্যে পরিণত করতে পারে শুধু পৃথিবীর কর্মী পুরুষরা। মানবেন্দ্র সে-দলে পড়েন না।

সিগারেটটা শেষ হবার আগেই মানবেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়লেন। জ্বলন্ত সিগারেটটা হাত থেকে খসে পড়ল নিচে চটি জুতোর ওপর, সেটাকে খানিকটা পুড়িয়ে তারপর নিভল।

ঘুমন্ত মানবেন্দ্রর চিবুকে ও ওষ্ঠে দুঃখের লেখা। অতৃপ্তি ও ক্লান্তির চিহ্ন ছোট ছোট রেখায় ছড়িয়ে আছে তার সারা মুখে। শিশুর মতন হাত দুটো গুটিয়ে আছে বুকের কাছে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে, শীত করার জন্যই হোক বা চোখের ওপর আলোর জন্যই হোক, মানবেন্দ্রর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসে বিভ্রান্তের মতো তাকালেন চারদিকে। একটু আগেকার কোনও কথা মনে করতে পারলেন না।

প্রথমেই আলোটা নিভিয়ে দিলেন। সেই সময় একটি এরোপ্লেনের বিশাল গম্ভীর শব্দ তাকে খানিকটা সচেতন করে দিল। পায়ে চটি লাগিয়ে তিনি এলেন দরজার কাছে।

এর মধ্যে টুরিস্ট লজ একেবারে নিস্তব্ধ। বাইরের সমস্ত আলো নিভে গেছে। কিন্তু আকাশে আজ জ্যোৎস্না আছে। সেই জ্যোৎস্নায় তিনি দেখলেন, বাগানের এলোমলো ছড়ানো চেয়ারগুলোর মধ্যে একটি মাত্র চেয়ারে এক জন কেউ বসে আছে।

প্রথমে মানবেন্দ্র ভাবলেন, ওখানে বসে আছেন তিনি নিজেই। যেমন মানসীর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম রাত্তিরে বসেছিলেন। তাছাড়া আর কে থাকবে! দরজার কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে আর কেউ নয়, সে অবাস্তব। কিংবা, আমি একই সঙ্গে বাগানের চেয়ারে বসে আছি এবং এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

ঘরের বাইরে এক পা ফেলে তিনি বুঝলেন, না, অন্য কেউ। আমি নয়। মানবেন্দ্র চমকে উঠলেন। পুরুষ না নারী? সাদা পোশাক। মানবেন্দ্র কোনও শব্দ না করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মূর্তিটা তার দিকে পেছন ফিরে বসা। মানবেন্দ্রর চিনতে অসুবিধে হল না, সাদা প্যান্ট-শার্ট পরে বসে আছে গৌতম।

চেয়ারে এক দিকে কাত হয়ে গৌতমের বসে-থাকা মূর্তিটা দেখে একবার মনে হয়, ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু একটু বাদেই তার ঝুলন্ত ডান হাতটা ওপরে উঠল, সেই হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

মানবেন্দ্র গৌতমকে ডাকলেন না। আজ সারা দিনই গৌতম খানিকটা গম্ভীর ছিল। হঠাৎ গাড়ি খারাপ হবার জন্য তো প্রোগ্রাম ওলোট-পালোট হয়ে যাবার জন্য তার মেজাজ খারাপ থাকতে পারে। সকালে-বিকেলে গৌতম ওদের দলের সঙ্গে বেরোয়নি, গাড়ির

পেছনে লেগে ছিল। সন্ধেবেলা মানবেন্দ্র যখন বারান্দায় বসে ছিলেন, তখন গৌতম গাড়ি নিয়ে ফিরল একা। মানবেন্দ্রকে সে লক্ষ্য করেনি, সোজা ঢুকে গেল নিজের ঘরে। খানিকটা বাদে মানবেন্দ্র একবার ওর ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, গৌতমের হাতে একটা ড্রিঙ্কসের গ্লাস, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে।

মানবেন্দ্র ওকে ডাকেননি। নিজে থেকে কারুর ঘরে যাওয়া কিংবা ডাকা তার স্বভাবে একেবারেই নেই। তিনি আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে এসেছিলেন। গৌতমও আর তার খোঁজ করতে আসেনি আগের দিনের মতো।

গৌতম ছেলেটি মোটেই সাধারণ নয়। সে একটা গল্পই সারা জীবনে বার বার লিখছে। চা বাগানের ম্যানেজারকে খুব খাটতে হয় নিশ্চয়ই, তবু সে বই পড়ে। সার্থক মানুষদের মতো ছটফটানি নেই তার চরিত্রে।

মানবেন্দ্র দাঁড়িয়েই রইলেন বারন্দায়। কুয়াশায় মতো জ্যোৎস্না। তারাগুলি আজ অনেক পরিষ্কার। চোখ তুললেই দেখা যায় কালপুরুষকে। তিনি এই গ্রহটিকে পাহারা দিচ্ছেন কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁটে।

মানবেন্দ্র অস্ফুট স্বরে কালপুরুষকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি পাব কি পাব না?

কালপুরুষ বললেন, তুমি পাবে না।

মানবেন্দ্র একটু ভর্তসনার সঙ্গে বললেন, একটু ভেবে-চিন্তে উত্তর দিতে হয়। হাউ ক্যান ইউ বি সো সিওর?

কালপুরুষ বললেন, আমার এক মুহূর্তই তো অনন্তকাল। অনন্তের মধ্যে কোনও ভুলের জায়গা নেই।

ড্যাম ইয়োর অনন্তকাল! আমার কাছে ছোট ছোট ক্ষণিক মুহূর্তগুলোই সত্য।

তুমি ওকে পাবে না।

আপনাকে বলে দিচ্ছি, জীবনে আর কিছু পাই বা না পাই, এই নারীকে আমি পাবই।

কালপুরুষ চোখের ইঙ্গিতে বললেন, ওই দ্যাখো ।

এত আস্তে দরজা খোলার আওয়াজ হয়েছিল যে, মানবেন্দ্র টেরও পাননি। গৌতমকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই তিনি সচকিত হলেন। দেখতে পেলেন, একটি ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটি নারীমূর্তি।

মানবেন্দ্র প্রথমে ভেবেছিলেন অনুরাধা। জ্যোৎস্নার বাগানে মেয়েটি পা দিতেই তিনি চিনতে পারলেন। মানসী ছাড়া আর কে হবে?

গৌতম এত রাত্রে নিজের স্ত্রীর জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে কেন? এ-রকম কোনও নিয়ম আছে নাকি?

মানবেন্দ্র শরীরে একটা শিহরণ বোধ করলেন। সহসা কোনও উপলব্ধিতে এ-রকম হয়। চিবুকটা চেপে ধরে তিনি ভাবলেন, আমি কি এই কদিন অন্ধ হয়ে ছিলাম। প্রথম থেকেই তো বোঝা উচিত ছিল, গৌতম আর মানসীর মধ্যে বাল্যপ্রণয়। অনুরাধা যে গল্পটা বলেছিল, সেটা আসলে মানসীর গল্প।

মানবেন্দ্র নিজেকে গোপন করলেন স্তম্ভের আড়ালে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীকে কিছু সময়ের জন্য অন্তত সরিয়ে আনা যায়, কিন্তু প্রেমিকের কাছ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ছিনিয়ে আনা যায় না। মানসী আমার জন্য নয়।

মানবেন্দ্র কালপুরুষের দিকে তাকিয়ে আবার ভর্ৎসনার সুরে বললেন, এত সত্যবাদী না হলেও তোমার চলত। এমন কিছু অপবাদ রটত না।

গৌতম এগিয়ে এসে মানসীর হাত ধরল। মানসী ছাড়িয়ে নিল হাত। গৌতম তখন দুহাতে মানসীর কাধ আঁকড়ে ধরে চুম্বন করল তাকে। কী অসম্ভব আবেগময় সেই চুম্বন, গৌতম যেন মানসীকে মিশিয়ে দিচ্ছে তার শরীরের সঙ্গে, মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন, মানসীর গোড়ালি দুটি উঁচু উঠছে।

তিনি ভাবলেন, খুব সাহস তো ওদের। দুটি ঘরের দরজা খোলা, তার মধ্যে শুয়ে আছে এক জনের স্ত্রী, এক জনের স্বামী। যে-কোনও মুহূর্তেই । মানবেন্দ্র নিজেও এ-রকম সাহস দেখিয়েছেন অনেক বার, কিন্তু তিনি ভাবতেন, পৃথিবীতে এ ব্যাপারে তিনিই সব চেয়ে সাহসী।

দীর্ঘকাল পরে চুম্বনটি শেষ হবার পর মানসী হাত দিল নিজের মুখে। তারপর কিছু বলল, এত দূর থেকে শোনা যায় না। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে গৌতমকে মিনতি করছে।

লেখক হিসেবে মানবেন্দ্র সহজেই অনুমান করতে পারলেন যে, মানসী এখন গৌতমকে কী কথা বলছে। সে বকছে গৌতমকে। সে বলছে, কেন গৌতম পাগলের মতো বাইরে বসে আছে। বার বার ঘুম থেকে উঠে উঠে মানসী জানলা দিয়ে গৌতমকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি। সে বেরিয়ে এসেছে, গৌতমকে ঘরে ফিরে যেতে বলার জন্য।

মানবেন্দ্রও এক দিন আগে ওই রকম ভাবে বসেছিলেন। মানসী টের পায়নি।

গৌতম মানসীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে। মানসী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে, কাকুতি-মিনতি করছে, কিন্তু গৌতম ছাড়বে না। সে মানসীকে নিয়ে গেল টুরিস্ট লজের বাইরে।

মানবেন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এখন যদি অসীম বা অনুরাধা ওঠে? কী আর হবে? দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে এক জন যদি আর এক জনের স্ত্রীর সঙ্গে মাঝরাতে একটু বেড়াতে যায়, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। পৃথিবী এখন অনেক বদলে গেছে। অনেক

হালকা হয়ে গেছে পাপ পুণ্য সম্পর্কে ধারণা। অনুরাধা কিছু কিছু জানে, তবু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না। অসীমরা আর গৌতমরা দুজায়গায় থাকে এখন, হয়তো বছরে একবার দুবার দেখা হয়। তাতে সমাজ-সংসার উলটে যায় না।

তবু, ঘুমন্ত স্বামীর পাশ থেকে উঠে কোনও নারী কি অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যায়? মানসী তো বাঙালি ঘরের মেয়ে। রাধা এ-রকম ভাবে স্বামীকে ছেড়ে যেত। কিন্তু রাধা বাঙালি নয়।

এমনও হতে পারে, অসীম নেশাগ্রস্ত হয়েছে বলেই মানসী জানে, সে আর সারা রাতে জাগবে না। স্ত্রীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু অনুরাধা তো নেশা করেনি। সে যদি হঠাৎ জেগে উঠে স্বামীকে পাশে না দেখে? কিংবা অনুরাধা কি জানে ব্যাপারটা? মুহূর্তে অনুরাধাকে অনেক মহান মনে হল। অসীমও কি জানে? নিজের বাল্যবন্ধুর এই দুর্বলতা সে ক্ষমা করে দেয়? মানসী বলেছিল, তারও একটা সমস্যা আছে, তা হলে এটাই?

মানবেন্দ্র চোখের সামনে দেখলেন এক বিশাল শূন্যতা। এই অন্ধকার পৃথিবীর থেকেও তা বড়। মানসী নেই। এত সহজে কী তাকে চোখের আড়াল করা যায়।

চটি খুলে রেখে মানবেন্দ্র খালি পায়ে দ্রুত অনুসরণ করলেন ওদের। টুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে ওরা ডান দিকের রাস্তাটা ধরেছে। জ্যোৎস্নায় পাতলা হয়ে যাওয়া অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে ওদের শরীরের রেখাচিত্র। মাঝে মাঝে দুটি শরীর এক হয়ে যাচ্ছে।

বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে মানবেন্দ্র পথের পাশ ঘেঁষে এগোতে লাগলেন। এদিকে রাস্তায় বাড়িঘর নেই, আর কোনও মানুষজন নেই। ওরা দুজনে নিশ্চিন্তভাবে হাঁটছে। শুধু মানবেন্দ্রর ভাবভঙ্গিই চোরের মতো। যদি ধরা পড়ে যান ওদের কাছে! ওরা ধরা পড়বে না, তিনিই ধরা পড়বেন। বুকের ভেতরটা এমন ফাঁকা, যেন এক জন সর্বহারা মানুষ।

মানবেন্দ্র বেশি কাছে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। যদিও তার খুব ইচ্ছে করছে ওদের কথাবার্তা শুনতে। মানসীর জীবনের গল্পটার সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি জানতে চান। কিন্তু তার উপায় নেই। কাল রাত্রে এই রাস্তাতেই মানবেন্দ্র পাগলের মতো দৌড়েছিলেন, আর আজ ওরা কত সুখের সঙ্গে হাঁটছে সেই রাস্তা দিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে গেল সেই উঁচু পাথরটার দিকে, যেটা মানবেন্দ্রর খুব প্রিয় জায়গা। ওরা পাথরটার ওপর বসবার পর মানবেন্দ্র একটা গাছের তলায় থমকে দাঁড়ালেন। একটা জিনিস অনুভব করে তিনি একটু অবাক হলেন, এখন তো তার চিন্তায় বা ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন তিনি পাগল নন। কী জন্য এ-রকম হল? রাগ কিংবা দুঃখবোধও তো নেই। ঈর্ষা আছে? না, না, না-

মানবেন্দ্র তাকালেন ওদের দিকে। ওরা পাথরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। কী সুন্দর এই দৃশ্য। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া আকাশের নিচে বসে আছে দুজন নারী-পুরুষ, যেন ওরা ভাসমান। পুরুষটির ভঙ্গির মধ্যে আছে ব্যাকুলতা। মেয়েটির মধ্যে স্বভাবব্রীড়া এবং অনেকখানি কুণ্ঠা। তবু মাঝে মাঝে মুখচুম্বন করছে ওরা। যেন এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করছে।

দ্বিধা কেটে গিয়ে মানবেন্দ্র মনটা নির্মল হয়ে গেল। ওদের দুজনের এই বসে থাকার দৃশ্যটাই এত সুন্দর যে, তার ওপরে আর কথা নেই। এখানে তৃতীয় ব্যক্তিকে মানায় না। এর আগে এক দিন মানবেন্দ্র যখন এখানে বসেছিলেন, তখন কোথা থেকে একটা কুকুরও অকারণে এসে বসেছিল তার মুখের দিকে চেয়ে। মানবেন্দ্রর নিজেকে এখন সেই কুকুরটার মতো অবান্তর মনে হল।

এখন এই জ্যোৎসার আকাশ, নির্জন পৃথিবী, পাহাড় জোড়া দিগন্ত এবং সুগন্ধ বাতাস – শুধু ওদের মনে পড়ে দুজনেরই প্রাপ্য।

মানবেন্দ্রর হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা গানের লাইন। এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে-। ওরা দুজনেই এই ধরণীর মাধুরী বাড়িয়েছে। সামাজিক সাংসারিক হিসেবে মেলে না, তবু তিনি টের পেলেন সেই মাধুরী।

ওদের সেখানেই রেখে মানবেন্দ্র ফেরার পথ ধরলেন। তার আত্মপরীক্ষার কাল শেষ হয়ে গেল। এখন ওষুধ ছাড়া অসুখ সারবে না। এক জন হেরে-খাওয়া মানুষ যদি আবার হারে –

কয়েক পা গিয়েই মানবেন্দ্র শুনতে পেলেন একটা অস্ফুট শব্দ। বেশ ধ্বনিময়। তিনি প্রথমে ভাবলেন গান। মানসী গান গাইছে। মুখ ফিরিয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেই বুঝতে পারলেন, গান নয়, কান্না। মানসী কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এখানে এ সময় এই কান্না কেন?

মানবেন্দ্র আর অপেক্ষা করলেন না। কান্নারও অনেক মানে হয়, এই কান্নাও ওদের দুজনের নিজস্ব।

টুরিস্ট লজে ফিরে এসে মানবেন্দ্র দেখলেন, দুটি ঘরে কোনওটিরই আলো জ্বলেনি।

তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। মানসী আর গৌতম কোনও ক্রমে ধরা পড়ে যাক, এটা তিনি চান না। ওদের ব্যাপারটা গোপন থাক। অসীম আর অনুরাধা এখন ঘুমিয়ে থাকুক। এতে বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতি হবে না।

নিজের খাটের ওপর অনেকক্ষণ সিধে হয়ে বসে রইলেন মানবেন্দ্র। মেরুদণ্ডটা টন টন করছে, তবু শুয়ে পড়ছেন না। মনটা নির্মল হয়ে গেছে। মানসীর জন্য সেই সাংঘাতিক ব্যাকুলতাটা আর বোধ করছেন না একটুও।

মানবেন্দ্র এক সময় অস্ফুট স্বরে বললেন, গৌতম আর মানসীও সুখী নয়, ওরাও দুঃখী। গোপন কথা মানে দুঃখ।

.

০৯.

কী রে মানু, অনেক দিন পর দেখছি।

কলকাতায় ছিলাম না।

রঙটা কালচে হয়ে গেছে। কোথায় গিয়েছিলি?

নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

তাপস মুখার্জি একটা চেয়ার টেনে মানবেন্দ্রর উলটো দিকে বসলেন। টুসকি দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, আমাকেও একটা হুইস্কি দাও। বিলটা এই বাবুকে দেবে।

তাপস মুখার্জি সিগারেট এগিয়ে দিলেন মানবেন্দ্রর দিকে। মানবেন্দ্র বিনাবাক্য ব্যয়ে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। তিনি প্রতীক্ষা করছেন, তাপস মুখার্জি কোন দিক থেকে তাকে আক্রমণ করবেন।

তাপস মুখার্জির বিশাল চেহারা। গলার আওয়াজ গমগমে। এঁর প্রবল উৎসাহী ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, বেঁচে থাকা একেই বলে। ইনি মানবেন্দ্রর প্রায় বাল্যবন্ধু, এখন বিখ্যাত প্যাথোলজিস্ট, অতি ব্যস্ত ও সার্থকপুরুষ, কিন্তু এরইমধ্যে হিমালয় ভ্রমণ বিষয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন, তাই সাহিত্যিকদের কাছে অপরিচিত নন। তাপস মুখার্জি পেশাগত ভাবে খুবই পরিব্যাপ্ত লোক হলেও কাজের কাছে সম্পূর্ণ ধরা দেননি। মনের মধ্যে ছুটি লুকিয়ে আছে। খুব কাজের মধ্যে থেকেও হঠাৎ এক-এক দিন বেরিয়ে পড়েন, ঘুরে বেড়ান উদ্দেশ্যহীন ভাবে। বারে, রেস্তোরাঁয় এসে খোঁজ করেন পুরনো বন্ধুদের।

তাপস আর মানবেন্দ্রর জীবন-দর্শন আলাদা। তাপসের জীবনে কোনও দ্বিধা নেই, তিনি জানেন, জীবনটা কীরকম ভাবে চলবে বা চলা উচিত। সেই জন্যই মানবেন্দ্রর প্রতি ব্যাপারেই ইতস্তত ভঙ্গি তার পছন্দ হয় না।

তাপস আকস্মিক ভাবে বললেন, তোকে জেলে আটকে রাখা উচিত। আমি যদি চিফ মিনিস্টার হতাম, তাহলে তোকে ডি আই আর-এ গ্রেপ্তার করে রাখতাম।

মানবেন্দ্র হাসিমুখে জিজ্ঞেসে করলেন, কেন? আমি কী দোষ করেছি।

কারণ, তোর লেখা খারাপ হচ্ছে। গত দু-তিন বছর ধরে কিচ্ছু ভাল লিখতে পারিসনি। যারা খাবারের কিংবা ওষুধে ভেজাল দিচ্ছে, তারা যেমন দেশের ক্ষতি করছে, সেই রকম যেসব রাইটার ভাল লেখে না তারাও সমান দোষী। সমাজ থেকে তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না বাপু, তোমার শুধু মন দিয়ে ভালো করে কবিতা লেখো, কিংবা উপন্যাস লেখো, গান গাও, ছবি আঁকো– তোমাদের তো কারখানায় গিয়ে হাতুড়ি ধরতে বলছি না, কিংবা দশটা-পাঁচটার অফিস করতে বলছি না? ময়দানে গিয়ে পলিটিক্যাল মিটিংও করতে বলছিনা।

মানবেন্দ্র সবটা মন দিয়ে শুনে বললেন, তাপস, তোরই চিফ মিনিস্টার হওয়া উচিত ছিল।

কি, আমি বেঠিক কথা বলছি?

না। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলো যারা শাসন করে, তারা একথা বলে না।

তাপস ধমক দিয়ে বললেন, আস্তে আস্তে খাচ্ছিস কেন? ভাল করে খা। যখন মদ খাবি, তখন সেটাও ভাল করে খাবি। যখন যেটা করবি, প্রত্যেকটাই ফার্স্ট রেট হওয়া দরকার।

তিনি হুঙ্কার ছেড়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, শিগগির আরও দুপেগ নিয়ে এসো। সব বিল এই বাবুকে দেবে, আমাকে না।

মানবেন্দ্র লক্ষ্য করলেন, তাপসের চোয়াল অন্য অনেকের চেয়ে বেশি চওড়া। এই রকম মুখ যাদের তারা বেশি সাহসী হয়। তারা অন্যদের ওপর হুকুম করে কথা বলতে পারে।

তাপস তার গেলাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, দেশের কোনও খবর রাখিস? তোকে আমি দুটো খবর দিই। পরশু দিন ক্যানিং-এর দিকে গিয়েছিলাম। দেখলাম, গ্রামের লোক ঘাস-পাতা কচু-ঘেঁচু খাচ্ছে। যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে শতকরা আশি জনই সাত দিনের মধ্যে এক দিন ভাত খায়। কী বুঝলি এতে?

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, দ্বিতীয় খবর কী?

পরে বলছি। তুই টেন ডেইজ দ্যাট শুক দা ওয়ার্ল্ড বইটা পড়েছিস তো? এ-দেশের অবস্থাও সেই দশ দিনের আগের দিনগুলোর মতো ঠিক। তবু এ-দেশে বিপ্লব হচ্ছে না। হবেও না। এই দেশে কিস্যু হবে না।

তুই আজ একটু বেশি উত্তেজিত আছিস মনে হচ্ছে? এমনকী তোর তুলনাতেও একটু বেশি।

হবে না? এইসব শুনে তোর রক্ত টগবগ করে ফোটে না? ইচ্ছে হয় না, সব শালাকে গুলি করে মেরে ফেলি?

দ্বিতীয় খবরটা তো এখনও বললি না?

দ্বিতীয় খবর হচ্ছে এই, দেশে যখন এ-রকম অবস্থা, সেইসময় তুই আর আমি এখানে বসে মদ খাচ্ছি। কী বুঝলি এতে?

অনেক কিছু বোঝার আছে, তাইনা?

হ্যাঁ, বোঝার আছে। আমি বলছিনা, অন্যরা খেতে পাচ্ছে না বলে আমরাও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব। আমার ডিম্যান্ড হচ্ছে, আমরা যেমন খাচ্ছি, অন্যরাও সে-রকম খেতে পাক। আমি ওই গরিবদের মতো হতে চাই না। গরিবরা আমার মতো হোক। ঠিক কি না?

ঠিক।

চল, তুই আর আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। দুটো রাইফেল জোগাড় করে সব ব্যাটা বদমাসের খতম করে দিই। কী, পারব না?

আমি কখনও রাইফেল ছোঁড়া শিখিনি।

খাঁটি কথা। যার যেটা কাজ। আমিই ভুল বলছিলাম। আমাদের দিয়ে হবে না। সোলজার চাই। সোলজার ছাড়া বিপ্লব হয় না, কোনও দেশে হয়নি।

তাপস, তুই একটু আস্তে কথা বল। বড্ড জোরে চ্যাঁচাচ্ছিস!

মানু, তোর জন্য আমার কষ্ট।

আমার জন্য? এত গরিব থাকতে আবার আমার জন্য কষ্ট কেন?

রাইটারদের ব্যাপার কি আমি বুঝি না। তারা সব ব্যাপারই ফিল করে, মনে মনে কষ্ট পায়, কাজে কিছু করতে পারে না। আমি যা পারব, তুইতা-ও পারবি না। আমি তবু গ্রামে গিয়ে ওষুধ বিলি করতে পারি। তুই কী করবি? লিখে কি হবে না। লেখা-ফেখা ছেড়ে দে।

যখন-তখন প্রসঙ্গে বদলান তাপস। বহুকথারই উত্তর আশা করেন না। নিজের মন থেকে কথাটা বার করে দিয়েই খুশি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, ও, তোকে একটা ঘটনার কথা তো এ এখনও বলিনি রে?

মানবেন্দ্র বললেন, আমি জানি তোর সে-ঘটনা আরও বেশি চমকাবার মতো হবে।

তুই বাণীশঙ্করের খবর শুনেছিস? কত বয়েস এখন? তিয়াত্তরনা চুয়াত্তর। উনি আজকাল একটা সতের-আঠারো বছরের মেয়ের সঙ্গে-।

এটা কি একটা খবর?

আরে শোন না! এই জন্য লোকে ওঁকে নিন্দে করছে। আমি একটু আগেও এক জায়গায় আলোচনা শুনে এলাম। কিন্তু নিন্দে করার কী আছে এর মধ্যে? আসলে বেশির ভাগ লোকই হিংসুটে। তারা ভাবছে এই একম একটা বুড়ো একটা কচি মেয়েকে পেয়ে গেল, আর আমরা পেলুম না! আরে বাবা, তোরা জোগাড় করে নে না, কে বারণ করছে? তা না, শুধু শুধু হিংসে। তাছাড়া, উনি আর্টিস্ট। তোদের যদি সেরকম ট্যালেন্ট থাকে।

মানবেন্দ্র পকেটে হাত দিতেই তাপস তার হাতটা চেপে ধরলেন। আবার ধমক দিয়ে বললেন, চালাকি করিস না চুপ করে বসে থাক। আমি সব বিল মেটাব। আজ একটা মাড়োয়ারিকে বধ করে আড়াইশো টাকা পেয়েছি!

মানবেন্দ্র বললেন, আমি কিন্তু এবার উঠব!

কোথায় যাবি?

বাড়ি।

বাড়ি! বাড়িতে কে আছে? তোর আবার বাড়ির ওপর এত টান হল কবে থেকে?

এখন পৃথিবীতে সব চেয়ে ভাল লাগে নিজের বিছানায় নিজের বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতে।

তাহলে এখানে এসেছিলি কেন?

এখন বুঝতে পারছি, এসে ভুল করেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষজনের সঙ্গে না মিশলে আমি পাগল হয়ে যাব। আবার মানুষজন কাছে এলে...।

ও-সব ছাড়। তুই এখন আমার সঙ্গে যাবি।

আমি কোথায় যাব?

একটা পার্টি আছে, চল তোর ভাল লাগবে।

মানবেন্দ্র কখনও কোনও উৎসব বা নিমন্ত্রণ বাড়িতে যান না। অনেক পার্টির নেমন্তন্ন গ্রহণ করেও কথা রাখেন না শেষ পর্যন্ত। অনাহুত ভাবে কোনও অচেনা জায়গায় যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তাপসের হাত থেকে নিস্তার নেই। কোনও রকম যুক্তি-আপত্তি শুনবেন না তাপস।

জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন। গাড়িতে মানবেন্দ্রকে পাশে বসিয়ে তাপস বললেন, তুই বড় একলা হয়ে যাচ্ছিস দিন দিন। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোকে নিয়ে যাওয়া উচিত না। অনেক মেয়েটেয়ে থাকবে সেখানে, মেয়েদের কাছে তোর যা ফিল্ড আছে, আমি আর পাত্তাই পাব না।

তবু কেন নিয়ে যাচ্ছিস!

ওই তো মজা। নিজের ক্ষতি হবে জেনেও মানুষ অনেক কাজ কি করে না?

সান্ত্বনা কেমন আছে?

ভালই আছে। তুই আমাদের বাড়িতে আসিস না কেন? সান্ত্বনা মনে মনে তোকে খুব পছন্দ করে, জানিস তো? আমি যখন বাড়ি থাকব না, সেই সময় গিয়ে তুই ওর সঙ্গে প্রেম করতে পারিস।

যাব। তুই কোন কোন সময় বাড়ি থাকিস না?

পুরো দুপুরটা। সন্ধে সাড়ে সাতটা আটটার আগে তো কোনও দিন বাড়ি ফিরি না। ছেলে স্কুল থেকে ফেরে চারটের সময়, তার আগে বেচারা একলাই থাকে, কিছুই করার নেই। তোর মতো এক জন লাভার-টাভার যদি পায়, মন ভাল থাকবে।

মানবেন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানসী। একটা স্কুলবাস এসে থামল। দুটি ছেলেমেয়ে নামছে।

তাপসের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, জীবনটা আবার নতুন ভাবে শুরু করা যায় না? কোনও উপায় নেই? না। আর সময় নেই। যে-জীবন শালিকের, দোয়েলের, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

তাপস তখনও বলে চলেছেন, জানিস তো, সান্ত্বনার স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়েছে। আমি ফিল করি, ওর এখন একজন প্রেমিক দরকার। সব ম্যারেড মেয়েদেরই, বিয়ের সাত-আট বছর বাদে এক জন আলগা ধরনের প্রেমিক থাকা ভাল–

মানবেন্দ্র বললেন, তাপস, তুই কীসে মরবি জানিস?

তাপস এক মুহূর্তও চিন্তা না করে বললেন, হ্যাঁ। অ্যাকসিডেন্টে। আর তুই?

পাগলা গারদে।

গোটা দুনিয়াটাই তো।

না, সেরকম অর্থে নয়।

তবে সেখানেই মর। যেখানে খুশি মরলেই হল। তবে, বেশির ভাগ লোকই ভাল করে মরতে জানে না। পুরো ব্যাপারটা ক্লামজি করে ফেলে।

তাপস অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির গতি অনেক বাড়িয়ে ফেললেন হঠাৎ। যেন এক্ষুনি একটা অ্যাকসিডেন্ট করার খুব ইচ্ছে তার। মানবেন্দ্র স্থির হয়ে বসে রইলেন।

.

বাড়িটি এক ডাক্তারের। সেখানে পনেরো-কুড়ি জন নারী-পুরুষ উপস্থিত। তাপসের সঙ্গে মানবেন্দ্রকে দেখে অনেকেই অবাক। অনেকেই মানবেন্দ্রর খ্যাতির কথা শুনেছে, বই না পড়লেও নাম জানে। সেই রকম এক জন মানুষ বিনা আমন্ত্রণে উপস্থিত। অতিরিক্ত খাতির-যত্ন করে তারা আরও অস্বস্তিতে ফেলল মানবেন্দ্রকে।

প্রচুর পানীয়, আনন্দ, মুরগি, সুন্দরী নারী। তাপস মানবেন্দ্রকে অন্যদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে বসিয়ে দিলেন দুজন মহিলার পাশে, সরবে বললেন, এরা দুজন তোর অনেক বই পড়েছে, খুব ভক্ত।

মানবেন্দ্র লাজুক, মুখচোরা হয়ে গেলেন। মহিলা দুটি মানবেন্দ্রর কোনও লেখাই পড়েনি। বই পড়ার স্বভাব নেই। ভদ্রতা দেখিয়ে কথা বলতে লাগল মানবেন্দ্রর সঙ্গে। এসব তাপসের দুষ্টুমি।

তাপস দুটো হুইস্কির গেলাস হাতে করে এনে মহিলা দুটিকে বললেন, জানেন তো, ওর পরের নভেলে আপনারা দুজনেই নায়িকা হয়ে যাচ্ছেন।

মহিলাদের মধ্যে এক জন সুশ্রী ভুরু তুলে বললেন, দুজনেই?

মানবেন্দ্র তাপসের হাত থেকে হুইস্কির একটা গেলাস নিয়ে এক চুমুকে অনেকটা খেয়ে ফেললেন। তৃষ্ণার্ত মানুষের মতো। তারপর তার ইচ্ছে হল, গেলাসটা মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে।

সেই ভঙ্গিতে গেলাসটা ধরে তিনি কঠোর ভাবে তাকালেন তাপসের দিকে। তাপস এক জন উল্লসিত সুখী মানুষ। মানুষের জন্য দুঃখ বোধ করার মতো অনুভূতি আছে, আবার নিজের জীবনে আনন্দ খুঁজে নিতে জানেন। তিনি মানবেন্দ্রকে বললেন, তুই গম্ভীর হয়ে আছিস কেন? মানুষের সঙ্গে না মিশলে তাদের কথা লিখবি কী করে?

পাশ থেকে এক জন লোক মানবেন্দ্রর কাঁধে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনি কি অনিরুদ্ধ মুখার্জিকে চেনেন? ওঁর স্ত্রী সুজাতা মুখার্জি এক দিন বলছিলেন।

মানবেন্দ্র বিড় বিড় করে বললেন, পুরুষ মানুষের স্পর্শ আমি একদম পছন্দ করি না।

লোকটি তা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কী বললেন?

হ্যাঁ চিনি। আমি যখন খেতে পেতাম না, তখন এক কাপ চা ও বিস্কুটের লোভে ওদের বাড়িতে যেতাম মাঝে মাঝে।

যেন দারুণ একটা হাসির কথা, এই ভঙ্গিতে হেসে উঠলে লোকটি।

তাপস বললেন, সুজাতা তো আমাদের ক্লাসমেট ছিল। আর অনিরুদ্ধটা তো একটা গ্রেট বাস্টার্ড।

মহিলাদের সামনে এই কথাটা উচ্চারণ করেও একটুও লজ্জা পেলেন না তাপস। পাশের লোকটি বলল, অনিরুদ্ধ আমার পিসতুতো ভাই।

মানবেন্দ্র মনে হল, এই ঘরটার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এখানকার লোকজন, কথাবার্তা, সবই যেন দারুণ দুর্বোধ্য। কোনও কিছুরই মানে হয় না। আমি এখানে কেন?

ঘরের অন্য কোণ থেকে একটি কুমারী মেয়ে মানবেন্দ্রর সামনে এসে বলল, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আপনি বিরক্ত হবেন না তো?

তাপস মানবেন্দ্রর দিকে চোখের চটুল ইশারা করে বললেন, বলেছিলাম না!

অন্য দুটি মহিলা সরে গিয়ে এই নতুন মেয়েটিকে বসার জায়গা করে দিল। মেয়েটি বলল, আমি আপনার সব বই পড়েছি। এর মধ্যে একটা বই আপনি আমাকে নিয়ে লিখেছেন। আপনি কী করে আমার কথা জানলেন?

মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, আই ওয়ান্ট টু শ্লিপ উইথ ইউ। আমি একা ঘরে থাকি। তুমি আজ রাত্তিরেই আমার সঙ্গে সেখানে যাবে?

মেয়েটির ছোট্টখাট্টো চেহারা। গলার আওয়াজটা বেশ মিষ্টি। একে বুকে জড়িয়ে ধরলে বুকের অনেকটা জায়গা ফাঁকা থেকে যাবে। যেন একটা সুন্দর পাখি।

মানবেন্দ্র বললেন, এবার সেই বইটার দ্বিতীয় খণ্ড লিখব।

ঠিক লিখবেন? লিখুন তো, দেখি, পরেরটুকুও মেলে কিনা।

পরের সব ঘটনা এখনও ঘটেনি। কিছু কিছু বাকি আছে না?

আপনি যে এক জায়গায় লিখেছেন- ।

মানবেন্দ্র ভাবলেন, আমি পর পর তিন দিন বাড়ি থেকে একেবারেই বেরোইনি। অসহ্য লাগছিল। মানুষের মুখ দেখার জন্য তাই সন্ধেবেলা বেরিয়েছিলাম। সেখান থেকে তাপস টেনে এনেছে এখানে। একে বলে ঘটনার পরম্পরা। এর পর কী হবে?

সুস্থ থাকতে হলে, আমার দরকার কাজ। লেখালেখি ছাড়াও আরও নানা রকম প্রচণ্ড কাজের মধ্যে নিজেকে যদি ব্যস্ত রাখা যায়। আর দরকার নারী। এই যে মেয়েটি এসে বসেছে।

ঘরের অন্য সকলে তখন দেশের দুর্দিন বিষয়ে আলোচনা করছে।

মানবেন্দ্র একটু হাসলেন। এই মেয়েটি যদি জানতে পারত, তার শ্রদ্ধেয় লেখক মনে মনে কী ভাবছে। মানবেন্দ্র ভাবলেন, এখান থেকে উঠে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে নিরিবিলিতে এক জায়গায় কথা বলবেন। সেখানে দু-একটা অসভ্য কথা শোনাবেন ওকে। এখন একটু আদর করা ও ফস্টিনস্টি করারই তো সময়।

সেই মুহূর্তেই তার মনে হল, একটু দূরেই মানসী বসে আছে। চমকে তাকালেন। মানসীই তো। মানসী ভ্রূভঙ্গি করছে তার দিকে। মানসী অসভ্য কথা বলা একদম পছন্দ করে না। আবার দেখলেন, না। মানসী না। যে-মহিলা কথা বলার সময় ভুরু তোলে তাকে মানসী ভেবেছিলেন। অথচ এর সঙ্গে মানসীর কোনও মিল নেই।

মানবেন্দ্র একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আবার রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি?

অন্যমনস্ক হবার জন্য তিনি এ-পাশের মেয়েটির দিকে ফিরে বললেন, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। আমার সৌভাগ্য যে তোমার সঙ্গে দেখা হল।

এ কী বলছেন? সৌভাগ্য তো আমারই।

পাশ থেকে মানসী বলল, সে তো অনেক দিন আগেকার কথা!

মানবেন্দ্র আবার চমকে তাকালেন। সত্যিই তো মানসী। এতক্ষণ তিনি মানসীকে দেখতে পাননি? সেই সাদা সিল্কের শাড়ি পরা।

মানসী যেই এ-পাশে মুখ ফেরাল অমনি সে আবার সেই ভুরু-তোলা মহিলা হয়ে গেল।

মানবেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

নতুন মেয়েটিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নামটাই জানা হয়নি।

মেয়েটি বলল, আমার নাম নিশি। নিশি লাহিড়ী।

নিশি? এ-রকম নাম কখনও শুনিনি। নিশীথ ছেলেদের নাম হয়।

কিন্তু রাত্রি মেয়েদের নাম হয়। নিশি কেন হবে না?

মেয়েটির নাম শুনেই মানবেন্দ্রর আবার মনে হল, আজকে পুরো সন্ধেটাই অবাস্তব। এই ঘটনার অস্তিত্ব নেই, এই মানুষজনের অস্তিত্ব নেই, তিনি এখন কোনও অনূঢ়ার সঙ্গে কথা বলছেন না। এটা একটা মায়া-দৃশ্য।

তিনি মনে মনে বললেন, এরা আমার কেউ নয়। আমি এদের কেউ নেই।

অথচ বাঁচতে হলে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। চাই কাজ। চাই প্রেম, সহানুভূতি, ছোট ছোট সুখ। সব কিছু সম্পর্কে একটা দায়িত্ব বোধ।

মানবেন্দ্র নিশিকে জিজ্ঞেস করলেন, ভালবাসা কাকে বলে?

এ কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?

আমি জনি না। সত্যিই জানি না।

একথা বলার সময় মানবেন্দ্রর মুখখানা এমন করুণ হয়ে গেল যে, নিশি বেশ চমকে গেল। তার বয়েস কম। ভালবাসা শব্দটা শুনেই তার মুখে একটা অরুণ আভা ফুটেছে।

মানবেন্দ্র ভাবলেন, আমি যদি এক্ষুনি আড়ালে গিয়ে নিশিকে চুম্বন করি, যদি তার বুকের আঁচল সরিয়ে- তা হলে সেটাকে নিশ্চয়ই কেউ ভালবাসা বলবে না। অথচ আমার মনে সেই রকম একটা ইচ্ছে জাগছে।

কে যেন কাঁদছে? স্পষ্ট কান্নার শব্দ শুনে মানবেন্দ্র জান পাশে তাকালেন। দেয়ালের পাশে একা বসে আছে মানসী। ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটা দুঃখে সে কাঁদছে। সেই বাইরে, টুরিস্ট লজ থেকে খানিকটা দূরে বড় পাথরটার ওপর মধ্যরাত্রে গৌতমের পাশে বসে যেমন ভাবে সে কাঁদছিল।

মানবেন্দ্র আর সব কিছু ভুলে গেলেন। এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন সেই কান্না। তার বুকের মধ্যে দুপ দুপ শব্দ হচ্ছে, হাত কাঁপছে।

তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, মানসী –

এর মধ্যেই ভুলে গেলেন, আমার নাম নিশি, মানসী নয় ।

মানবেন্দ্র শুনতে পেলেন, কী একটা হাসির কথায় ঘরের সবাই একসঙ্গে হাসছে। মানসী অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মানবেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে নিশিকে বললেন, আমি একটু আসছি।

কয়েক পা এগোবার পরেই তাপস তার হাত চেপে ধরে বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?

তাপসের পাশেই এক জন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সেই জায়গাটা কোথায়?

তাপস বললেন, ওই তো দরজা থেকেই বেরিয়ে ডান দিকে। আলাপ করিয়ে দিই। এঁর নাম মানসী চ্যাটার্জি। অ্যাসট্রো ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করছেন।

মানবেন্দ্র একটুও চমকালেন না। মানসী একটা বহু প্রচলিত নাম। তিনি নিজেই আরও দুজন মানসীকে চেনেন। মহিলার মুখের দিকে ভাল করে না তাকিয়েই তিনি একটা নমস্কার করে বললেন, আমি এক্ষুনি আসছি।

বাথরুমে ঢুকে মানবেন্দ্র টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, দেয়ালে হাত দিয়ে কোনওক্রমে দাঁড়ালেন। ভয় করছে। বাঁচতে হবে। আমি এদের কেউ নই, এরা আমার কেউ নয়। এই বাথরুম থেকে বেরুতে পারব তো?

বাথরুমটা মস্ত বড়। ঝকঝকে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। একটা দেয়াল-তাকে নানা রকম সুদৃশ্য শিশি-বোতল-টিউব।

আবার পা টলে গেল কেন? আমার কি বেশি নেশা হয়েছে? সে-রকম তো হবার কথা নয়। এখনও আমার পা কাঁপছে।

মানবেন্দ্র চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরে বললেন, এ-রকম করলে চলবে না। আমি কেন এত চোখে ভুল দেখছি! এত স্বপ্ন নিয়ে জীবন কাটানো যায় না। সামাজিক হও, দায়িত্ববান হও, মানুষের কথা ভাবো–

বেসিনের কাছে এসে মানবেন্দ্র ভাল করে চোখে মুখে জল দিয়ে খানিকটা সুস্থ বোধ করলেন। আরও ঝাপটা দিলেন কয়েক বার। মুকে খানিকটা জল দিয়ে কুলকুচি করতেই ঠকাস করে একটা শব্দ হল। মানবেন্দ্রর মনে হল, তার একটা দাঁত খুলে গেল। বেসিনে নয়, মাটিতে।

মানবেন্দ্র ভুরু কুঁচকে দাঁতটা খুঁজতে লাগলেন। এ আবার কী ব্যাপার! হঠাৎ একটা দাঁত ভেঙে পড়বে কেন!

খোঁজাখুঁজি করে সেটা পাওয়া গেল না। বেসিনে মাথা ঠুকে গেল একবার। তবু মানবেন্দ্রর জেদ চেপে গেছে, জিনিসটা কী দেখতেই হবে।

আমি খুঁজে দিচ্ছি।

মানবেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন, গৌতম এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। একটু অবাক হয়ে ভাবলেন, গৌতম কী করে এল? তিনি কী বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন?

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী খুঁজবেন?

আপনার দাঁতটা!

আমার দাঁত? তার মানে? আমার কি বাঁধানো দাঁত নাকি? এই দেখুন, আমার সব দাঁত ঠিক আছে। কোনও দিন দাঁত-টাত ভাঙেনি আমার।

মানবেন্দ্র ঠোঁট ফাঁক করে নিজের দুপাটি দাঁত দেখালেন গৌতমকে।

গৌতম জিজ্ঞেস করল, আপনি তাহলে কী খুঁজছিলেন?

কী জানি। জানি না তো!

এই দেখুন, আমার দুটো দাঁত ভাঙা, আপনি সে-দিন এত জোরে আমাকে মেরেছিলেন!

মানবেন্দ্র স্তম্ভিত ভাবে বললেন, আমি মেরেছি? আপনাকে? তা কখনও হতে পারে?

সে-দিন আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন।

মানবেন্দ্র চিৎকার করে বলেন, অসম্ভব! অসম্ভব।

গৌতম ভদ্র ও বিনীত ভাবে বলল, মানসীকে আমি খুব ছেলেবেলা থেকে চিনি। আমরা কেউ কারুকে চাই না। আমি চাই না আমার বন্ধু অসীমকে ঠকাতে। আমি চাই না অনুরাধাকে দুঃখ দিতে। মানসীও চায় না অসীমকে দুঃখ দিতে, অনুরাধাকে দুঃখ দিতে। মানুষের এমনিতেই তো কত দুঃখ আছে। আমরা চাই না আড়ালে দেখা করতে। তবু মানসী আমাকে চুম্বকের মতো টানে। ও যেন আমারই আর একটা সত্তা।

এ-সবই তো আমি জানি।

আপনি মানসীকে চেয়েছিলেন?

সে অন্য রকম চাওয়া।

আমি মানসীকে রাত্তিরবেলা নিয়ে গিয়েছিলাম বলে আপনি এমন রেগে উঠলেন।

মানবেন্দ্র আবার চেঁচিয়ে বললেন, এ-সব কী হচ্ছে কী? আমি পাগলের মতো একা একা বক বক করছি। কোথায় গৌতম! বন্ধ বাথরুমের মধ্যে কী করে আসবে?

মানবেন্দ্র আবার চোখে জলের ঝাপটা দিলেন। চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল। বাথরুমে আর কেউ নেই। তিনি নিজের গালে একটা রাম চিমটি কেটে বললেন, আমি মাঝে মাঝেই

নানা রকম কাল্পনিক দৃশ্য দেখি বটে। কিন্তু মানুষ মনে মনে যা চায়, সেই রকমই তো স্বপ্ন কিংবা দিবাস্বপ্ন দেখে। তাহলে এ-রকম দেখলাম কেন? আমি কি গৌতমকে মারতে চেয়েছি? কক্ষনও না। গৌতম চমৎকার ছেলে! কারুকে মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়া তো একটি উদ্ভট ব্যাপার।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে মানবেন্দ্র বেরুবেন ঠিক করছিলেন, আবার মনে পড়ে গেল দাঁতটার কথা। দাঁত বা যাই হোক, মুখ থেকে কী যে একটা ঠক করে পড়ল। কী হতে পারে? সেটা না জানতে পারলে রাত্তিরে ঘুম হবে না। মানবেন্দ্র আবার সেটা খুঁজতে লাগলেন।

খুঁজতে খুঁজতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মাটিতে। তারপর আবার দেখলেন, গৌতম এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। মানবেন্দ্র মনের একটা স্তরে বুঝতে পারলেন, এটা চোখের ভুল, এটা কল্পনা। আর একটা স্তরে প্রশ্ন করলেন, আমার কল্পনায় আমি গৌতমকে এখানে দেখতে পাচ্ছি কেন?

মানবেন্দ্র হাত জোড় করে অত্যন্ত কাতর ভাবে বললেন, গৌতম, বিশ্বাস করো, আমি তোমার ওপর একটুও রাগ করিনি! আমি যদি ভুলেও তোমাকে কোনও কষ্ট দিয়ে থাকি, আমাকে ক্ষমা করো।

মানবেন্দ্রবাবু, আপনি এ কী করছেন? আপনি উঠুন! আপনি পৃথিবীতে যা চান, সবই আপনাকে দিতে পারি, শুধু মানসীকে ছাড়া। আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা, তবু যদি আপনি রাগ করে থাকেন আমার ওপরে– ।

না, আমি রাগ করিনি! রাগ করিনি!

আপনি অসীমকে অপছন্দ করেন না, তার ওপর আপনার রাগ নেই, কিন্তু আপনি আমাকে ঘৃণা করেন।

না না।

আপনি সত্যি কথা বলছেন না।

গৌতম, কী করে তোমাকে বিশ্বাস করাব।

আপনি উঠুন।

না, উঠব না। আগে বলো, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না!

আপনি উঠুন, শিগগির উঠুন।

আমি উঠতে পারছি না। আমার পা এখানে গেঁথে গেছে।

কে যেন দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছে। আর সময় নেই। এর মধ্যে গৌতমকে বোঝাতেই হবে। মানবেন্দ্র কেঁদে ফেললেন। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, গৌতম, আমি রাগ করিনি। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, আমাকে ক্ষমা করো।

মানবেন্দ্রকে অনেকক্ষণ অনুপস্থিত দেখে তাপস ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাথরুমের দরজায় অনেক ধাক্কা দিতেও মানবেন্দ্র খোলেননি। সকলে তখন ভয় পেয়ে যায়। দরজার ওপরে, স্কাইলাইট সরিয়ে সেখান থেকে দেখতে পাওয়া গেল মানবেন্দ্র মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন!

দরজা খুলে মানবেন্দ্রকে ধরাধরি করে আনা হল বাইরে। সেখানে বেশ কয়েক জন ডাক্তার। অনেক রকম পরীক্ষা ও বিভিন্ন উপদেশ। মানবেন্দ্রর গুরুতর কিছুই হয়নি। অতিরিক্ত মদ্যপান কিংবা অতিরিক্ত ক্লান্তি বলে ধরে নেওয়া হল।

একটি ইঞ্জেকশন দেবার পরই মানবেন্দ্রর জ্ঞান ফিরে এল। তাপস তাকে পৌঁছে দিতে এলেন বাড়িতে।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে মানবেন্দ্র বললেন, ঠিক আছে, তোকে আর আসতে হবে না। আমার এমনিই হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

তাপস তবু এলেন ওপরে। তালা খোলার পর ঘরে ঢুকে তাপস আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

ঘরটা একেবারে শুন্য। আগে এই ঘর বই ও জিনিসপত্তরে ঠাসা ছিল। এখন একটাও বই বা আলমারি বা চেয়ার-টেবিল কিচ্ছু না! শুধু মাঝখানে একটা খাট পাতা। সাদা চাদর ও বালিশ। বালিশের পাশে একটা লেখার প্যাড আর কলম। প্যাডের প্রথম পাতাটা খোলা, সেখানে একটা আঁচড় পড়েনি।

তাপস জিজ্ঞেস করলেন, এ কী?

মানবেন্দ্র শান্তভাবে বললেন, একটা নতুন কিছু লিখব ভাবছি, কিছুতেই শুরুটা মাথায় আসছে না।

ঘরের সব জিনিস কোথায় গেল?

বিক্রি করে দিয়েছি।

কেন?

এমনিই।

তুই কি বাড়ি বদলাবি নাকি?

হয়তো।

তাপস এবার মানবেন্দ্রর কাঁধে হাত রেখে গাঢ়স্বরে বললেন, মানু, আমি তোর পুরনো বন্ধু।

মানবেন্দ্র বললেন, চঞ্চল আমাকে ভুলে গেছে।

চঞ্চলের কথা জানিনা, তবে আমার মনের মধ্যে তোর জন্য একটা নরম জায়গা আছে। তোর কী হয়েছে আমাকে বলবি না?

তাপস, আমি আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

কী আজেবাজে কথা বলছিস?

আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময়েও মিথ্যে কথা বলি না তোকে।

তাপস এবার এক ধমক দিয়ে বললেন, তোর মাথায় বুঝি এই সব ঢুকেছে। এসব শিল্পীদের খামখেয়ালিপনা। মনটাকে শক্ত কর।

আমার মন কোথায় আমি জানি না।

ডোন্ট বি অ্যান অ্যাস। শোন, আমি ডাক্তার হিসেবে বলছি। এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাকবি। কাল সকালে কোথাও বেরুবিনা। আমি কাল নিজে এসে তোকে আমার ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাব। দেখবি, দুটো-চারটে ইঞ্জেকশান ফুঁড়লেই মনটা চাঙ্গা হয়ে যাবে!

আচ্ছা।

আচ্ছা মানে কী? আমার সব কথা শুনে চলতে হবে তোকে এখন থেকে।

শান্ত ছেলের মতো মানবেন্দ্র বললেন, শুনব।

এখন ঘুমো। তোর ভাল করে ঘুম দরকার।

তাপস চলে যাবার পরও মানবেন্দ্র খাটের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে বললেন, ইস, মানুষের ঈর্ষা এত সাজ্ঘাতিক হয়! নিজের চোখে আজ দেখলাম।

খুব ব্যস্তভাবে মানবেন্দ্র আবার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর জামা-প্যান্ট ভিজে গিয়েছিল, সেগুলো বদলাবার কথাও মনে পড়ল না। তালা না লাগিয়েই নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। তাপসের গাড়ি কাছাকাছি নেই। বেশ রাত হয়েছে, রাস্তা জনশূন্য। মানবেন্দ্র হাঁটতে লাগলেন হন হন করে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা হেঁটে আসার পর মানবেন্দ্র থামলেন একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ির সামনে। অন্তত একশো বার এই বাড়ির সামনে দিয়ে মানবেন্দ্র পারাপার করেছেন, কখনও ভেতরে ঢোকেননি।

মানসী আসতে বলেছিল, অসীম ঠিকানা দিয়েছিল, তবু আসেননি মানবেন্দ্র। মনের মধ্যে কোথাও তো একটা শক্ত জায়গা থাকা দরকার। মানসীর সামনে আবার দাঁড়াতে গেলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষের মতোই যেতে হবে।

বড় রাস্তার ওপর দুটো ঠ্যালা গাড়ির ওপরে ঘুমোচ্ছ তাদের চালকরা। নিচে দুটো কুকুর। কাছেই একটা দুধের গুমটি। একটা ট্যাক্সি ছুটে গেল ভয়-পাওয়া গতিতে।

মানবেন্দ্র একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে টের পেলেন, তার বুক কাঁপছে, হাত কাঁপছে। ফিস ফিস করে বললেন, মানসী, আমি এসেছি!

সাদা বাড়িটার সবকটি ঘরই অন্ধকার। ওপর তলার বাঁ-দিকের একটি ঘরের সব কটা জানলা খোলা। মানবেন্দ্র জানেন, ওই ঘরে মানসী শোয়।

উলটো দিকের ফুটপাথে একটা বন্ধ দোকানঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন মানবেন্দ্র। তাকিয়ে রইলেন সেই জানলা-খোলা ঘরটির দিকে।

একটু বাদে মানবেন্দ্র বুঝতে পারলেন, তার মন শান্ত হয়েছে। তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি নিম্নস্বরে বললেন, আমি বুঝতে পারিনি, আমার ভেতরে এতটা ঈর্ষা ছিল। আজ টের পেয়েছি বলেই সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি অত্যন্ত পছন্দ করি অসীম আর গৌতম

দুজনকেই। তোমাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি ভালবাসি ওদেরও। আমি ভালবাসি তোমার ভালবাসাকে। আমি সমাজের প্রভু নই। তোমার আর গৌতমের ভালবাসার বিচার করার ভার আমার ওপরে নয়।

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, এই যে রাত্রির আকাশ, এটা আমার নয়। তবু আমি একে ভালবাসতে পারি। তুমিও সেই রকম।

একটা বিড়াল গুটি গুটি পায়ে মানবেন্দ্রর অদূরে থমকে দাঁড়াল। বেশ তুলতুলে চেহারা বেড়ালটির। মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

বেড়ালটি বলল, ইডিপাশ।

মানবেন্দ্র বললেন, ও হ্যাঁ, তাই তো! আচ্ছা, তুমি কি মানসীকে বলে দিতে পারবে যে আমি এসেছিলাম?

বেড়ালটি বলল, ওই তো মানসী, জানলায়।

মানবেন্দ্র চোখ তুলে তাকালেন। না, জানলায় কেউ নেই। মানবেন্দ্র চোখে ভুলও দেখলেন না। তিনি বললেন, আমি যদি পাগল হতাম, তাহলে ও-বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে মানসীকে এক্ষুনি ডাকতাম। এই রাত-দুপুরে ওর সামনে হাজির হয়ে বলতাম, আমার সেই যে পূজা বাকি ছিল–। অসীমকে বলতাম, আমি কিছুই চুরি করতে আসিনি কিংবা আমি সেরকম কিছুই করিনি। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে!

মানবেন্দ্র আবার হাঁটতে লাগলেন উলটো দিকে। বাড়ি ফিরতে হবে। নতুন লেখাটা শুরু করতে হবে এবার। আজই। মানবেন্দ্রর হাঁটার মধ্যে এখন আর ব্যস্ততা নেই। একটুক্ষণ হাঁটার পর তিনি খেয়াল করলেন, রাস্তায় আর একটাও জনপ্রাণী নেই। এত বড় একটা রাস্তায় মাত্র এক জন মানুষ থাকলে মনে হয় যেন এই রাস্তাটা তারই নিজস্ব। কিংবা, এই পথটাও যেন তার নিজের মনগড়া।